বাঁকের মুখে

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আজকাল দুপুরের দিকে এই সময়টায় বড় ক্লান্তি আসে অর্পিতার। এক বিচিত্র ধরনের অবসন্নতা। অফিসের পরিশ্রমের কারণে নয়, এ যেন একটু অন্যরকম। টিফিন সেরে সিটে ফিরল কি ফিরল না, কোত্থেকে দু'চোখ জুড়ে ঘুম, ঘুম আর ঘুম। ঠিক ঘুমও নয়, একটা ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব। মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসতে থাকে, হাই ওঠে ঘন ঘন, চতুর্দিক কেমন ঝাপসা ঝাপসা। চোখের পাতা খুলে রাখা তখন কী যে কঠিন।

আজ অর্পিতা একটা ফাইল খুলে বসেছিল। প্রায় জেদ করে। ওই ঝিমঝিম ভাব তাড়াবেই। পারছিল না। দু'মিনিটেই এজিএমের নোট আবছা, ক্রমশ অক্ষরগুলো উধাও। নুয়ে নুয়ে পড়ছে মাথা, চারপাশে গুঞ্জন ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল।

তখনই সামনে মালবিকা। সিনিয়র টাইপিস্ট। চল্লিশ ছোঁয়নি, এর মধ্যেই যথেষ্ট পৃথুলা, মুখে সর্বক্ষণ জর্দাপান। এখনও মুখ চলছে কচর কচর। অর্পিতার দোদুল্যমান দশা দেখে হাসছে মিটিমিটি।

– কী গো অর্পিতাদি, আজকের দিনেও ঢুলছ?

অর্পিতা ধড়মড়িয়ে সোজা হলো। চোখ থেকে রিডিং গ্লাস নামিয়ে পাতা দুটো রগড়াল একটুক্ষণ। ছোট্ট হাই তুলে বলল,

– আর পারি না। বয়স তো হচ্ছে।

– কত হলো? সত্তর? আশি?

– ফাজলামি করিস না। আর মাত্র বারো বছর চাকরি বাকি।

– সে তো অনেক দিন। তার মানে আর একটা পে-কমিশনের বেনিফিট নিয়ে যাবে।

অর্পিতা হেসে ফেলল। বয়স যেন পে-কমিশন রিটায়ারমেন্টের হিসেব নিয়ে বাড়ে! ঘুম পুরোপুরি তাড়ানোর জন্য মাথা ঝাঁকাল জোরে। বলল,– তা তোদের হিসেবপত্র সব শেষ হলো?

– ধুৎ, যে যা খুশি ক্যালকুলেশন করছে। কারুর সঙ্গে কারুর মেলে না। উল্টোদিকের চেয়ার টেনে বসল মালবিকা,– প্রদীপবাবু যোগ-বিয়োগ করে দেখিয়ে দিল সতেরশ' বাড়ছে। দত্তদা পেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল চোদ্দশ'। এদিকে আমার কর্তা আজ সকালে কত কষল জানো? একুশশ'। কোনটা ধরি বলো?

– কোনওটাই না। নিজে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসে যা। যেমন সব্বাই করছে।

– ধুস, ওসব কি আমার দ্বারা হয়? ডি-এ মার্জ করো, ইন্টেরিম রিলিফটা ধরো, তারপর এত পারসেন্ট বাড়াও, তার সঙ্গে এতগুলো ইনক্রিমেন্ট অ্যাড করো...! জানো, আমার ছেলে কী বলে? মা, তুমি অংকে কালিদাস!

বিটকেল উপমায় হেসে ফেলল অর্পিতা। হাল্‌কা দৃষ্টি চালাল আশপাশে। টিফিন টাইম পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তবু এখনও প্রকাণ্ড হলঘরটার বেশিরভাগ আসনই শূন্য। অথচ অফিসেই আছে সব। থোকা থোকা জটলায় ভিড় করে আছে তিন-চারটে টেবিলে।

সকাল থেকেই অফিসের আজ এই চেহারা। কাজকর্ম শিকেয়, চলছে শুধু জল্পনা-কল্পনা। আজই সবে খবরের কাগজে পে-কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতেই এই সাজ সাজ রব।

ঠোঁটের কোণে পানের কষ। সাপটে মুছে নিল মালবিকা। চোখ টিপে বলল,– তোমার হিসেব কী বলছে গো?

– কী আবার বলবে?

– সিলেকশন গ্রেডে আছ, তোমার তো বেশ মোটাই বাড়বে, তাই না?

অর্পিতাও নিজের মতো করে একটা হিসেব সেরে ফেলেছে মনে মনে। তবুও হাত ওল্টালো,– কে জানে! হাতে পেলে বুঝব।

– তোমার তেমন গা নেই মনে হচ্ছে? কত টাকা এরিয়ার হবে জানো? প্রায় ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ মাস... হাজার ষাট-পঁয়ষট্টি তো বটেই।

– দিক আগে। স্টেট গভর্নমেন্টের দেখাদেখি আমাদেরটাও যদি পিএফে ঢুকিয়ে দেয়?

– ইল্লি রে! কোনও দিন গর্তে ঢোকায়নি, এবার কেন...? মালবিকার বাক্‌ভঙ্গিতে এখনও এক ধরনের ছেলেমানুষি আছে, আহ্লাদি আহ্লাদি গলায় বলল,– কু গাইছ কেন অর্পিতাদি? আমি বলে কবে থেকে কত কী ভাঁজছি! কাজের মেয়েটার সপ্তাহে দু'দিন ডুব বাঁধা, প্রথমেই একটা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন কিনে ফেলব। ফ্রিজটাও বদলে আড়াইশ' লিটার করে নেব ভাবছি। হবে কি না জানি না, আরও একটা ইচ্ছে আছে...

– কী রে?

– কর্তা বলছিল, তোমার টাকাটা হাতে এলে আমিও অফিস থেকে একটা লোন নিয়ে নেব। বাড়িটার ভাল করে মেরামতি দরকার। এক ধাক্কায় দেওয়াল-টেওয়ালগুলোর প্লাস্টিক পেইন্ট করে নিলে... ওই যে টিভিতে একটা অ্যাড দেখায় না... পিয়ানো বাজছে, ঘরের রঙ্ বদলে যাচ্ছে...

সংগোপনে ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলল অর্পিতা। ভারী। উষ্ণ। অন্যের সুখকে সে হিংসে করে না, তবু কোথায় যেন একটু বেঁধে তো বটেই। এ জীবনে কিছুই তার মনমতো হলো? সেই ভাড়াবাড়ির খাঁচায় বাস, অহরহ টেনশন... কী করে জোড়াতালি দিয়ে সংসারটা চলছে তা অর্পিতাই জানে। মালবিকার মতো বিলাসী স্বপ্ন দেখার সাধ্যই নেই তার। এখনও পর্যন্ত বুবলি লালটুর পড়াশোনাটা চালাতে পারছে, এই না ঢের। ষাট-সত্তর হাজার টাকা আজকালকার দিনে কিছুই নয়। তবে টাকাটা হাতে এলে অর্পিতার কিছু সুসার তো হবেই। তারও কয়েকটা পরিকল্পনা আছে। দেখা যাক কদ্দূর কী হয়!

পাশের টেবিলে খিলখিল হাসির ঝংকার। পম্পাকে কী যেন বলেছে সুতনু, হাসি থামছে না পম্পার। পে-কমিশনের সুপারিশে নতুনরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান, তাই তাদের ফুর্তিও বুঝি আজ মাত্রাছাড়া।

মালবিকা চোখ গোল গোল করে তাকাল,– অ্যাই, কী হয়েছে রে? এমন লুটোপুটি খাচ্ছিস কেন?

– সুতনুদা যা একখানা জোক বলল না...

– কী জোক?

– চেঁচিয়ে বলা যাবে না গো। হি হি। আবার মুখে দোপাট্টা চেপেছে পম্পা।

মালবিকা আর থাকতে পারল না, পড়িমরি করে ছুটেছে ও-টেবিলে।

পম্পাদের ঝলক দেখে নিয়ে চোখ সরিয়ে নিল অর্পিতা। লঘু রসিকতায় তার উৎসাহ কম। ওই টাটকা ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে সে মালবিকার মতো মিশতেই পারে না। বয়সের ব্যবধানই কি একমাত্র কারণ? তার যখন বয়স কম ছিল তখনইবা কত হাহা হিহি করতে পেরেছে? এই দুনিয়ায় সবকিছু সবার জন্য নয়।

চশমাটা নিয়ে অর্পিতা নাড়াচাড়া করল একটু। নতুন উদ্যমে ফাইলে মনোনিবেশ করার আগে উঠে টয়লেটে এল। ঘাড়ে-মুখে জল থুপল ভাল করে। আঃ, আরাম। আজ বড্ড বেশী গুমোট, আষাঢ় পড়ে গেল, আসি

আসি করে এখনও বর্ষার দেখা নেই। যাওবা মাঝে মাঝে ছিড়িক ছিড়িক ঝরছে, গরম আরও বেড়ে যাচ্ছে হু হু। ক'দিন ধরে হাওয়াও একেবারে নিশ্চুপ।

অর্পিতা রুমালে মুখ মুছল চেপে চেপে। বেসিন থেকে সরে আসছিল, দৃষ্টি আটকেছে আয়নায়। মলিন আলো, অস্বচ্ছ দর্পণ, কাচের গায়ে এক মধ্যবয়সী নারী। নির্মেদ চেহারায় বয়সের চেয়ে যেন একটু কমই দেখায়। উপবৃত্তাকার মুখ, দু'ভুরুর মাঝে ছোট্ট লাল টিপ, নিভাঁজ ত্বক- কাল এখনও তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি শরীরে। তবু মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে গেছে মুখ থেকে! কী যে?

প্যাসেজে ওয়াটার কুলার। টয়লেট থেকে বেরিয়ে অর্পিতা ঢকঢক করে ঠাণ্ডা জল খেল খানিক। আলস্য কেটেছে অনেকটা। ধীর পায়ে টেবিলে ফিরছিল, কী ভেবে কমলেশ ব্যানার্জির কাছে গেল।

কমলেশ অর্পিতার বহুকালের পুরনো সহকর্মী। বছর দুয়েকের সিনিয়র। মাঝে কিছুকাল বদলি হয়ে বাইরে ছিল, বছর চারেক হলো ফিরেছে হেড অফিসে। দরকার-অদরকারে কমলেশের সঙ্গে টুকটাক পরামর্শ করে অর্পিতা।

গাদাখানেক সার্ভিস বুক নিয়ে বসেছে কমলেশ। অর্পিতাকে দেখে মুখে অনাবিল হাসি,

– কী ম্যাডাম, মনে আজ ফুর্তি নেই কেন?

– নেই কী করে বুঝলেন?

– হুম। আপনাকে দেখে অবশ্য কোনও কালেই কিছু টের পাওয়ার জো নেই। ঈষৎ ভারী চেহারার কমলেশ চেয়ারে হেলান দিল,– পে-স্কেলের ব্যাপারটা কী বুঝছেন, অ্যাঁ?

– সিনিয়ররা বোধ হয় এবার খুব একটা মার খাবে না। মাইনেটা তাও একটু ভদ্র গোছের হবে।

– কচু হবে। চোখেও দেখতে পাবেন না। আলু দশ টাকায় উঠে গেছে, পেঁয়াজ তো চোদ্দর নীচে নামেই না, তেল পঁয়তাল্লিশ, আদা-লংকা যখন তখন তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে...

– শুধু মানুষের দামই কমছে।

– মোক্ষম বলেছেন। হা হা হা।

অর্পিতাও হাসল, ঠোঁট টিপে। সামান্য ঝুঁকে বলল,– আচ্ছা, এরিয়ারের টাকাটা তো দিয়ে দেবে, তাই না?

– এখনও পর্যন্ত তো সেরকমই মনে হচ্ছে।

– মালবিকা বলছিল টাকাটা নাকি ষাট-সত্তর মতো হবে?

– অন্তত পঞ্চাশের বেশি তো বটেই।

অর্পিতা আর একটু ঝুঁকল,– একটা কথা ভাবছিলাম।... আপনি তো এসব বোঝেন টোঝেন, তাই...

– কী ব্যাপারে বলুন তো?

– গত মাসে দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি গেছিলাম। বোড়ালে। ওখানে জামাইবাবু একটা জমি দেখাল। আমার ইচ্ছে ছিল না, প্রায় জোর করেই...

– জমি কিনছেন?

– ভাবছি।

– কতটা জমি?

– দু'কাঠার একটু কম।

– কী রকম চাইছে?

– এক লাখ পনেরো। মানে কাঠা প্রায় ষাট হাজার। জামাইবাবু অবশ্য বলছিল কিছু কমতেও পারে।

কমলেশ একটুক্ষণ চোখ কুঁচকে রইল। তারপর বলল,– প্রাইস তো রিজনেব্‌লই মনে হচ্ছে। আমাদের সোদপুরের ওদিকটায় তো এখন আশি, এক লাখ...। পছন্দ হলে দেরি না করে কিনে ফেলুন।

– কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে। বোড়াল নাম শুনেই ছেলেমেয়ে যা নাক কুঁচকোচ্ছে।

– কেন? বোড়াল তো বেশ ভাল জায়গা। আমি অবশ্য ওদিকে বিশেষ একটা যাইনি। একবারই শুধু একটা বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে...। একটু গ্রাম গ্রাম ঠিকই, তবে প্রচুর নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, রেগুলার বাস-টাস চলছে...। বলতে বলতে থমকালো কমলেশ,– আপনার ছেলেমেয়ের অবশ্য একটু আপত্তি হওয়ারই কথা। একদম হার্ট অব দ্য সিটিতে থাকে, বালিগঞ্জে বর্ন অ্যান্ড ব্রট্ আপ...

– ওটাই তো হয়েছে মুশকিল। জমি বাড়িতে ওদের আগ্রহই নেই। দু'জনেরই এক রা– কিনতে হলে ফ্ল্যাট কেনো। ধারে কাছে কোথাও।

– ওরেব্বাস! বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট কিনবেন?

– একটু-আধটু সরতে ওরা রাজি। যেমন ধরুন ঢাকুরিয়া, যাবদপুর, কী নিউবালিগঞ্জ...

– ওদিকেও কি ফ্ল্যাটের দাম কম? বিকাশ তো ঢাকুরিয়ায় থাকে, ওর মুখে শুনছিলাম মিনিমাম হাজার টাকা স্কোয়্যার ফিট। তাও মেইন রোড থেকে বেশ ভেতরে। ওখানে একটা পায়রার খোঁপ নিলেও আপনার পাঁচ-ছ' লাখ বেরিয়ে যাবে। তবে যা শুনছি, আমাদের হাউজ লোনের অ্যামাউন্টও নাকি বাড়ছে। সম্ভবত পাঁচ লাখ লিমিট হবে।

– আহা, সে টাকা বুঝি শোধ করতে হবে না? মাইনে থেকে তিন-চার হাজার করে কাটলে খাব কী? অর্পিতা শুকনো হাসল,– জমিটা খুব ভাল ছিল, জানেন। চারধারে সবুজ, পাশে একটা পুকুর, দু'পা হাঁটলেই বাস, হাত বাড়ালেই বাজার...

– তাহলে চোখ-কান বুঁজে কিনেই ফেলুন। চেপেচুপে দামটা লাখে নামান। এরিয়ার প্লাস পিএফ লোন কিছু নিলে হয়ে যাবে। কমলেশ ক্ষণকাল থেমে থেকে অনুচ্চ স্বরে বলল,– ছেলেমেয়েকে বোঝান ভাল করে। আপনার হেল্‌পলেস অবস্থাটা তো ওরা ছোট থেকেই দেখছে। কত কষ্ট করেছেন আপনি, একা একা ওদের মানুষ করতে যে লড়াইটা আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন...

ওফ্, ঘুরেফিরে সেই করুণাবাক্য। অর্পিতার সমান মাইনে পেয়ে অফিসের বেশিরভাগ পুরুষই তো একাই সংসার টানছে, সন্তান প্রতিপালন করছে। কই, তাদের নিয়ে তো কেউ আহা-উহু করে না? মেয়েদের জন্য পুরুষরা সব সময়েই একটা অন্য মাপকাঠি ধরে বসে আছে। ভাল লাগে না।

অপ্রসন্ন ভাবটা অবশ্য কমলেশকে বুঝতে দিল না অর্পিতা। এরকম মধ্যযুগীয় প্রশংসাপত্র তো তাকে বারো বছর ধরেই গ্রহণ করতে হচ্ছে। ঘরে-বাইরে, আত্মীয়স্বজন মহলে, সর্বত্র।

কমলেশের সঙ্গে আরও দু-চারটে কথা বলে অর্পিতা নিজের আসনে এল। বেলা গড়াচ্ছে, আলাপ-আলোচনা মুলতবি রেখে সকলেই এখন মোটামুটি কাজে ব্যস্ত। অর্পিতাও ডুবল নোটশিটে। মাথা তুলল আধঘণ্টা পর। চোখ জ্বলছে বেশ, টনটন করছে মনি দুটো। চশমার পাওয়ার বাড়ল কী? ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তবে সেও তো এক ঝকমারি। চোখের ডাক্তাররা এত বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখে!

চোখকে আরাম দেয়ার জন্য জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলল অর্পিতা। আশপাশে তেমন উঁচু বাড়ি নেই, তাদের এই চারতলা থেকে অনেকটা খোলা আকাশ দেখা যায়। সকাল থেকে নীল আর মেঘে লুকোচুরি খেলছিল, এখন আকাশ গাঢ় ধূসর। বৃষ্টি নামবে কি? মনে হতেই চেয়ারে ঝোলানো ঢাউস ব্যাগখানা অর্পিতা ছুঁয়ে দেখল একবার। নাহ্, ছাতাটা আছে। চট করে স্মরণ করার চেষ্টা করল ছুটির পর কী কী কাজ আছে আজ। পাড়ার দোকানের চা পাতাটা ভাল নয়, চামড়ার গুঁড়ো চামড়ার গুঁড়ো লাগে, লালবাজারের মুখ থেকে চা কিনতে হবে।

বুবলির মাস্টার মশাই জীববিজ্ঞানের জন্য একটা রেফারেন্স বই-এর নাম দিয়েছেন, বইটা পাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে না, আজ একবার কলেজ স্ট্রিট গিয়ে দেখবে নাকি? থাক, আজ আকাশের গতিক সুবিধের নয়। কমলেশবাবুকে বললে হয়, উনি তো হেঁটেই শেয়ালদা যান, যদি একবার বইপাড়া ঘুরে...। উঁহু, নিজের কাজ নিজেরই করা উচিত। আর একটা কী যেন করার ছিল আজ? কী যেন? সাবান? বিস্কুট? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ফেরার পথে ইলেকট্রিকের দোকানে যেতেই হবে। ছোট ঘরের ফ্যানের রেগুলেটরটা কবে থেকে খারাপ হয়ে আছে। লাল্টুকে বলে বলে তো মুখের ফেকো উঠে গেল। আজ বাদে কাল বর্ষা তো নামবেই, তখন রাতভর ফুল স্পিডে ফ্যান চললে তুইই তো হেঁচে কেশে মরবি। এত্ত ভুলো মন হয়েছে ছেলেটার! পর পর তিন দিন গ্যাসের দোকানে নাম লেখাতে ভুলে গেল। সতেরো দিনে ডেলিভারি দিচ্ছে গ্যাস, কী যে হবে এই মাসে? ইশ, শোওয়ার ঘরের জানলা আজ বন্ধ করে বেরোন হয়নি, বৃষ্টি এলে বিছানা ভিজে জাব হয়ে যাবে।

বুবলিটা মনে করে বন্ধ করবে কী?

সন্তোষ ঘুরছে টেবিলে টেবিলে। টিফিন আওয়ারের পর এবার টি-টাইম। চোখা চোখা মন্তব্য উড়তে শুরু করেছে। সবই প্রায় সন্তোষের উদ্দেশে।

–কোন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে চা বানাচ্ছিস রে সন্তোষ?

–অ্যাহ, আজ চিনির বদলে স্যাকারিন দিয়েছিস নাকি? তেতো তেতো লাগে কেন?

–আমার কিন্তু এটা নিয়ে চব্বিশটা হল। হিসেবে জল মেলাস না।

সন্তোষ নির্বিকার। বধির সেজে থাকলেই সন্তোষের বেশি নাফা। এই অফিসেরই পিওন সে।

চা বিক্রি তার উপরি কামাই। মাসিক হিসেবে গরমিল উপরির ওপর বোনাস।

অর্পিতা অবশ্য দিনের দাম দিনেই মেটায়। খাতা লেখালিখির ঝামেলায় যাওয়া তার একেবারেই না-পসন্দ্। বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিতে দিতে পয়সা বার করছিল, এ জি এমের খাস পিওন সামনে এসে হাজির, দিদিমনি, স্যারের ঘরে আপনার ফোন।

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে এ জি এমের ঘরের দিকে গেল অর্পিতা। কে ফোন করছে এখন?

বুবলি? লাল্টু?

এ-জি-এম বিমল করগুপ্ত অতি সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। ভদ্রলোকের ব্যবহার ট্যাবহার এমনিতে ভালই, তবে বড় বেশি নারীকাতর। মেয়েদের পেলেই যত রাজ্যের ড্যাজরং ভ্যাজরং শুরু করে দেয়। আজ বিমল কী নিয়ে যেন খুব ব্যস্ত। জোর আলোচনা চলছে লিগাল অফিসারের সঙ্গে। অর্পিতাকে দেখে আঙুল তুলে টেলিফোনটা ওঠাতে বলল।

ভুরুতে ভাঁজটুকু নিয়েই রিসিভার তুলল অর্পিতা, হ্যালো?

লাইনে বিশ্রী ক্যারকেরে আওয়াজ। ক্ষীণ একটা কণ্ঠ শোনা গেল, মিসেস সেন বলছেন? আমি আসানসোল থেকে বলছি।

-কোথ্ থেকে?

–আসানসোল। আসানসোল থেকে।

আসানসোল থেকে আবার কার ফোন? ভাবনাটার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎঝলক।

অর্পিতার শরীর আপনা আপনি শক্ত হয়ে গেল।

–শুনতে পাচ্ছেন ম্যাডাম? আপনি মিসেস অর্পিতা সেন তো?

–হাঁ...

–আপনার হাজব্যান্ড... মানে শুভেন্দু সেন গুরুতর অসুস্থ। ওঁকে আসানসোল হস্‌পিটালে ভর্তি করা হয়েছে। ... আমি শুভেন্দু সেনের কলিগ বলছি। রথীন দাস। ... হ্যালো ম্যাডাম... হ্যালো... হ্যালো...

কানের পরদায় তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক। ক্ষীণ কণ্ঠ ক্ষীণতর হতে হতে ডুবে গেল। কুঁক কুঁক আওয়াজ হচ্ছে লাইনে। আর্তনাদের মতো।

রিসিভার আর একটু কানে চেপে রইল অর্পিতা। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখেছে।

থম থম করছে মুখ।

বিমল জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে, –কী হল? কেটে গেল?

অচেতনের মতো মাথা নাড়ল অর্পিতা। হ্যাঁ বলল. নাকি না বলল, বোঝা গেল না।

বাড়ি ফিরে তক্ষুণি ছেলেমেয়েদের কিছু বলল না অর্পিতা। বিছানায় ব্যাগ রেখে সোজা বাথরুমে। মাথার পিছনটা ভয়ানক দপদপ করছে। আগুন ছুটছে সর্বাঙ্গে।

একটা মাত্র উড়ো ফোন এভাবে টলিয়ে দিল তাকে?

কী অনুভূতি হচ্ছে এখন অর্পিতার? বিরক্তি? রাগ? উৎকণ্ঠা? ঘৃণা?

অর্পিতা জানতে চায় না। আর চায় না বলেই মাথাটা আরও তেতে যাচ্ছিল তার। আশ্চর্য, কেন যে ভাববে ওই বজ্জাতটার কথা? লোকটা বাঁচল কি মরল, তাতে অর্পিতার কী আসে যায়?

চেপে চেপে কল খুলল অর্পিতা। জল নেই, শুধু ঘড় ঘড় আওয়াজ। মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম নিঃশ্বাসের মতো। ঝুঁকে দেখল চৌবাচ্চার জলও তলানিতে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কুনকুন করতে থাকা বিচিত্র অনুভূতিটা তীক্ষ্ণ স্বর হয়ে ঠিকরে এসেছে,– বুবলি? ... অ্যাই বুবলি..,? কলে জল নেই কেন রে?

বুবলি থাকে নিজের ঘোরে। এক ডাকে তার সাড়া পাওয়া ভার।

লাল্টুর জবাব উড়ে এল, বিকেল থেকেই তো নেই। কলেজ থেকে ফিরে আমিও ভাল করে হাত মুখ ধুতে পারিনি।

-তো পাম্প চালাতে বলিসনি কেন?

–বলেছিলাম। পাম্প নাকি খারাপ হয়ে গেছে।

আবার? অর্পিতার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। এই এক নতুন খেলা শুরু করেছে বাড়িওয়ালা।

মাসের মধ্যে পনেরো দিন পাম্প বিকল। ধীরেন মিত্তির নিজেই চায় না পাম্পটা ঠিক থাকুক। ব্যাটা ছিল ঘোড়ার ডাক্তার এখন স্ক্রুডাইভার রেঞ্জ নিয়ে নিজেই মিস্ত্রি বনেছে, খুটুর খুটুর কী সব ইঞ্জিনিয়ারিং চালায় নিজেই, কিছুতেই মিস্ত্রি ডাকবে না। আদ্যিকালের মেশিন, অর্পিতারা এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছে প্রায় দু'যুগ হল, তখনই ওই মেশিন গড়গড় করত, এখনও ওই পাম্পই রগড়াচ্ছে।

অর্পিতা যেচে বলেছিল, নতুন একটা কিনে নিন না। যদি বলেন, আমিও কিছু কন্ট্রিবিউট করছি। পরে সুবিধে মতো মাসে মাসে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে।

মিষ্টি মিষ্টি করে কত কথা শুনিয়ে দিল কমলদি, ভাড়াটের কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নতুন পাম্প কিনতে হবে, আমাদের এখনও অত দুর্দশা হয়নি অর্পিতা। দাও তো মোটে নশো টাকা, তার থেকে কী কাটব, কিইবা হাতে থাকবে! তাছাড়া ঘরের জিনিস যেই বিগড়োতে শুরু করল ওমনি তাকে বিদায় করতে হবে, এ শিক্ষাও তো আমরা পাইনি ভাই।

শেষ ইঙ্গিতটা কোন দিকে অর্পিতা কি বোঝেনি? যাক গে, বলুক গে, অর্পিতার কী জ্বালা সে তো অর্পিতাই

জানে। কোনও দিনই কি শান্তিতে থাকতে পারল?

ছিড়িক ছিড়িক দু'মগ জল গায়ে ঢেলে বেরিয়ে এল অর্পিতা। শোওয়ার ঘরে এসে শাড়ি পরছে।

বুবলি দরজায়,

–মা, আজ কিন্তু মালতীর মা বিকেলে আসেনি।

– কেন?

– কী করে বলব? টিউটোরিয়াল থেকে ফিরে দেখি সব যেমনকে তেমন পড়ে। ..... একটু আগে বাসনগুলো আমি মেজে দিয়েছি।

অন্যদিন হলে লক্ষ্মী মেয়ে বলে বুবলির গালে একটু টোকা দিত অর্পিতা। এখন কপাল কুঁচকে বলল,

– তার মানে বিকেলের রান্নাও হয়নি।

–ন্যাচারালি।

–ফ্রিজে কী কী আছে?

–শুধু মাছের ঝোল। সকালেরটা।

–হুম। অর্পিতা প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল, তোরা বিকেলে কিছু খেয়েছিস?

–মুড়ি মেখেছিলাম, চানাচুর দিয়ে। দাদাকে একটা ওমলেটও ভেজে দিয়েছি।....আটা মেখে দিতে হবে?

অবসাদটা ফিরে আসছেই। রুটি করতে আর মন চাইছে না। অর্পিতা মাথা নাড়ল, ... -থাক গে, ভাত করে নেব।

বুবলি তবু দাঁড়িয়ে। চোখ বড় বড় করে দেখছে মাকে।

কী দেখে মেয়ে? অর্পিতার চেহারায় অন্য কোন ছাপ পড়েছে কি?

অর্পিতা মুখ ফিরিয়ে নিল, –মাথাটা খুব ধরে আছে রে। এক কাপ চা খাওয়াবি?

–সঙ্গে খাবে কিছু?

– নাহ্। শুধু চা।

বুবলি চলে যাচ্ছে। মেয়ের গমন পথের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল অর্পিতা। বুবলি যেন ঝটকা দিয়ে হঠাৎই অনেকটা বড় হয়ে গেল। এই তো সবে ফাল্গুনে পনেরো পূর্ণ হয়েছে, হাবভাব করে যেন পূর্ণবয়স্ক নারী। বড্ড মুডিও হয়েছে মেয়ে। ইচ্ছে হল তো যেচে ঘরের কাজ করে দিল, আবার মন না চাইলে কুটোটি নাড়বে না। দাদার সঙ্গে খুনসুটিও চলে জোর। এই হয়তো গলা ছেড়ে গান গাইছে. এই মুখে কুলুপ, গালে হাত দিয়ে বসে আছে উদাসীন। টিনএজ সিনড্রোম।

এই বয়সের মেয়েরা বড় বেশি স্পর্শকাতর হয়। শুভেন্দুর খবরটা কী বুবলিকে জানাবে? শুনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে মেয়ের? শুভেন্দু যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, বুবলি তখন মাত্র তিন বছরের। বুবলির মনে কি বাবার কোনও স্মৃতি আছে আদৌ? অবশ্য স্মৃতি না থাকাটাও তো এক ধরনের স্মৃতিই।

বিছানা জয়পুরি বেডকভারে ঢাকা। গেল পূজোয় দিদি রাজস্থান থেকে এনে দিয়েছিল।

অর্পিতাদেরও যেতে বলেছিল সঙ্গে, বাসনা থাকলেও অর্পিতার হয়ে ওঠেনি। বুবলি ক্লাস নাইন, লাল্টু ফার্স্ট ইয়ার অনার্স... এ অবস্থায় কি মাস্টার টিউটোরিয়াল কামাই করে তিন হপ্তার জন্য ঘুরতে বেরোন যায়?

পাশ বালিশে মাথা রেখে শুল অর্পিতা। প্রকাণ্ড খাটের ঠিক মাঝখানটিতে। পাখা ঘুরছে বনবন, অথচ গায়ে

যেন একটুও হাওয়া লাগছে না। ছুটির পর ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছিল অফিস পাড়ায়, এদিকে দক্ষিণ কলকাতা খটখটে, গরমটাও বেজায় ভ্যাপসা। স্নানটাও হল না ঠিকমতো, চিটচিচ করছে গা। বিচ্ছিরি। বিচ্ছিরি।

অর্পিতা গায়ের আঁচল সরিয়ে দিল। পাশ ফিরেছে। আসানসোল থেকে যে ভদ্রলোক ফোন করছিল, কী যেন নাম বলল? রথীন? না ব্রতীন? ওফ্, টেলিফোনটাও এমন গণ্ডগোল করল। অবশ্য নাম দিয়ে অর্পিতার হবেইবা কি? শুভেন্দু বাঁচল, না মরল, তাতে তার কি আসে যায় এখন? লোকটা তো অর্পিতাদের কাছে মৃতই। কোনও সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই...। অর্পিতা রাখতেও চায় না খবর। তবুও লোকটার বাঁচা আর মরে যাওয়ার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাত তো আছেই। নইলে খবরটা পাওয়ার পর কেনই বা হৃদয়ে এমন ওঠাপড়া? ঘৃণা হোক, বিরক্তি হোক, অপমানবোধ হোক কিছু তো একটা রয়েই গেছে।

হল কি শুভেন্দুর? মদ খেয়ে খেয়ে লিভার পচিয়ে ফেলল? না আরও অন্য কোনও ঘৃণ্য ব্যাধি?

অত ঘি তেল মশলায় ঝোঁক, নারীসঙ্গ করার তীব্র লালসা, সুরা পানে অত আসক্তি..... দেহ তো এক সময়ে না এক সময়ে প্রতিশোধ নেবেই। বছর তিনেক আগে একবার নাকি বেহেড মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে মাথা ফাটিয়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল বেশ কিছুদিন। সমাচারটা শুভেন্দুর দাদার মুখে শোনা। আশ্চর্য, দাদা বোনরা সারাজীবন ভায়ের নিন্দেমন্দ করেই খালাস, ভাইকে শোধরানোর চেষ্টা কেউ করল না কোনও দিন। সবাই যার যার, তার তার। পাছে সামান্যতম দায়িত্ব নিয়ে ফেলতে হয় এই আশঙ্কায় অর্পিতাদেরও খোঁজখবর রাখে না সেভাবে। ওই মাঝে মাঝে অতিথির মতো এল, কী কেমন আছ গোছের কুশল বিনিময়, কিংবা কাজেকর্মে নেমন্তন্ন, ব্যস্। তার বেশি আর অর্পিতাদের সঙ্গে কিইবা সম্পর্ক তাদের? লাল্টু তো আজকাল জেঠা পিসির বাড়ি যেতেই চায় না।

অর্পিতা কি তাদেরই খবরটা দিয়ে দেবে? তোমাদের মায়ের পেটের ভাই, তোমরাই বোঝো! কে জানে তারা হয়তো আগেই জেনে গেছে। জেনেও বসে আছে ঘাপটি মেরে। যার স্বামী, সে বুঝুক!

তো অর্পিতা এখন কী করবে? ছুটবে ? কেন ছুটবে?

খাওয়া-বসায় ফালিটায় টিভির আওয়াজ। কোনও খেলা চলছে বোধহয়। লাল্টুটা ক্রিকেট ফুটবলের পোকা। একটা জয়ধ্বনি মতো উঠছে না? কমেও গেল উল্লাসটা।

অর্পিতা গলা ওঠাল, –লাল্টু?

–ডাকছ মা?

–হচ্ছেটা কী? টিভি এত জোরে কেন?

–এই একটু স্কোরটা দেখছি মা।

– আস্তে চালাও। কানে লাগছে।

কমল শব্দ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে বেশি খ্যাচাখেচি করতে হয় না অর্পিতাকে। বুবলি লাল্টু দু'জনেই মোটামুটি বাধ্য। বোধহয় অর্পিতার দুঃখটা বোঝে।

বুবলি চা দিয়ে গেছে। গরম চায়ে চুমুক দিতে মন্দ লাগছে না। কিন্তু মাথাটা ছাড়ে না কেন? শুভেন্দুর জন্য সত্যি সত্যি কি অর্পিতা বিচলিত হয়ে পড়ল? নাকি এ রুটিন মাফিক মাথা জ্বালা?

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল হঠাৎ। কাপ নামিয়ে তড়িঘড়ি জানলা বন্ধ করল অর্পিতা।

তাদের অংশটা এ বাড়ির একেবারে পিছন ভাগে। জানলার খানিক তফাতে ছোট্ট একখানা টিনের চালা, বীরেশবাবুর ছেলে ব্যবসার মালপত্র রাখে। টিনের চালে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃষ্টিকণারা কর্কশ বাজনা বাজাচ্ছে। এ শব্দটাও অর্পিতার কানে লাগছিল বড়।

অর্পিতা আর শুল না। রান্নাঘরে এসে ভাতের জল বসাল। লাল্টু শুধু মাছের ঝোল দিয়ে খেতে পারবে না, দু'খানা আলুও ছাড়ল জলে। খাওয়ার সময়ে ঘি দিয়ে মেখে দেবে। বৃষ্টির তেজ বাড়ছে ক্রমশ। রান্নাঘরের

খুপরি জানলা দিয়ে ঝিলিক ঝিলিক বিদ্যুৎ ঢুকে পড়ছে। কড়কড়াৎ ধ্বনিতে বাজ হেঁকে উঠল। শুভেন্দুই কি টেলিফোনটা করতে বলেছিল? কী করবে অর্পিতা গিয়ে? সেবা? কী আহ্লাদ রে! অসুখটা বাধিয়েছে কি অর্পিতার সমবেদনা পাওয়ার আশায়? নাকি হাতের টাকা পয়সা সব ফুড় ৎ, তাই অর্পিতা গিয়ে উদ্ধার করবে তাকে? নির্লজ্জ! নিঘিন্নে! দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে একবার কথা বললে হত। ওরাই তবু সুখে দুঃখে পাশে থাকে, অর্পিতাকে ভালমন্দ বুদ্ধিটা দেয়। কিন্তু এখন এই বৃষ্টিতে ফোন করতে কোথায় দৌড়াবে অর্পিতা? বাড়িতে টেলিফোন নেব নেব করেও নেওয়া হচ্ছে না, এবার দরখাস্ত একটা করে ফেলতেই হবে। সকালে অফিসে গিয়েই ফোন করবে দিদিকে? কিন্তু লোকটা যেভাবে বলল... যদি দেরি হয়ে যায়?

বুবলি লাল্টু দু'জনেই টিভিতে মগ্ন। জোরে জোরে চলছে না টিভি, তবু তার শব্দ ভাসে বাতাসে।

মিশ্র ধ্বনি। একটুক্ষণ লাল্টুর খেলার চ্যানেল, খানিক পরেই বুবলির সিরিয়াল। খেলার হর্ষ আর নাটুকে বিষাদ সব কেমন একাকার মনে হয়।

অর্পিতা এসে ছেলেমেয়ের পাশে বসল। তাকিয়ে আছে টিভির পর্দায়, দেখছে না কিছু।

লাল্টু হঠাৎ ঘুরে বসে বলল, জানো মা, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

-উঁ?

-আজ ওপরে জেঠুর কাছে এক প্রোমোটার এসেছিল।

-কেন?

-বা রে, বুঝতে পারলে না? পাড়ার সব পুরোন বাড়িতেই তো প্রোমোটাররা এখন ছিপ ফেলছে। দরজা নক করে করে কার্ড দিয়ে যাচ্ছে। কত কী অফার! ফ্ল্যাট, সঙ্গে ক্যাশ...। জেঠুর কাছে ইয়া এক ফরেন কার হাঁকিয়ে এসেছিল।

-তুই জানলি কী করে লোকটা প্রোমোটার? বুবলি তর্ক জুড়ল।

-আমি লোকটাকে চিনি। ওই তো, রাজাদের বাড়িটা ভাঙছে।

-ওমা, রাজাদাদের বাড়িও ভাঙ্গা হচ্ছে নাকি? আমি তো কিছু জানি না।

-তুই একটা লেবদুস। বোনকে উড়িয়ে দিয়ে মার দিকে ফিরল লাল্টু, -আচ্ছা মা, এ বাড়ি ভাঙা হলে আমরাও তো একটা ফ্ল্যাট পেতে পারি! এ বাড়িতে আমরা তো কম দিন নেই। ক'বছর হল যেন?

-একুশ বাইশ হবে।

-তা হলে? আমাদের তো রাইট জন্মেই গেছে। রাজাদের বাড়ির ভাড়াটেরাও তো ফ্ল্যাট পাচ্ছে। রাজাই বলছিল, যতটা এরিয়া নিয়ে ভাড়া আছে ততটাই নাকি...। তুমিও জেঠুকে সাফ বলে দেবে, হয় ফ্ল্যাট দাও, নয় ক্যাশ। নইলে আমরা বাড়ি ছাড়ব কেন?

-সে দেখা যাবে 'খন। আগে তো আমাদের জানাক। উঠে যেতে বলুক। তারপর নয়...

অর্পিতা কথাটা শেষ করল না। মুখ ফুটে লাল্টুকে বলতে পারল না, এ বাড়ি ভাঙা হলে ফ্ল্যাট টাকা কিছুই দাবী করার অধিকার অর্পিতার নেই। কারণ ভাড়ার রসিদ এখনও কাটা হয় শুভেন্দুর নামে। লাল্টু বুবলিও অবশ্য জানে সে কথা। তবে ব্যাপারটা এখন অবধারিত, এমনভাবে চলে আসছে, যে অর্পিতারও কথাটা স্মরণে থাকে না সব সময়ে। একটা মানুষ না থেকেও কেমন নিঃসাড়ে একটা অস্তিত্ব বজায় রেখে দিয়েছে সংসারে। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে একটা অধিকারও। বীরেশকে কেন বলতে পারেনি অর্পিতা, ভাড়া যখন আমিই দিই, রসিদটাও আমার নামেই হোক? আসলে অর্পিতা সেভাবে ভাবেইনি কখনও। নিজের অজান্তেই টিকিয়ে রেখেছে শুভেন্দুর নামটাকে। অফিসে এখনও মিসেস সেন বনে থাকার মতো।

কিন্তু শুধু কি এটুকুই? হৃদয়ের অতলে কোনও এক আশা পুষে রাখেনি অর্পিতা, লোকটা একদিন অনুতপ্ত হয়ে

ফিরে আসবে, সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে আবার! যাকে ইংরেজিতে বলে, দে উইল লীভ হ্যাপিলি এভার আফটার?

অবাস্তব হাস্যকর চিন্তা। এমনটা হতেই পারে না।

তবু মনটা খচখচ করেই যাচ্ছে। ওই নামটুকু দিয়েই লোকটা যেন পরোক্ষে সামান্য ঋণী করে রেখেছে অর্পিতাকে। ডিভোর্স করলেই তো ল্যাটা চুকে যেত, কেন অর্পিতা সেটাই বা করেনি? প্রয়োজন অনুভব করেনি? কিন্তু সত্যিই কি তাই?

অর্পিতা বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। তারপর দুম করেই বলে উঠেছে, -শোন, কাল ভোরে আমার একবার আসানসোল যেতে হবে রে।

লাল্টু বুবলি কোরাসে বেজে উঠল, আসানসোল? হঠাৎ?

–অফিসে আজ ফোন এসেছিল। ওখানে তোদের বাবা খুব অসুস্থ। হাসপাতালে আছে। লাল্টু বুবলি মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। লাল্টু অস্ফুটে বলল, -তুমি যাবে?

–একবার দাঁড়িয়ে আসি।

লাল্টু গুম হয়ে গেল। বুবলিও চুপ। চোরা চোখে দেখছে মাকে।

অর্পিতা গলা ঝাড়ল। অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলল, -বলছিল কন্ডিশান খুব সিরিয়াস, একবার না গেলে কে কী ভাবে...

-কী হয়েছে?

-জানি না। শোনার আগেই তো লাইন কেটে গেল।

লাল্টু গোমড়া গলায় বলল, তোমার যাওয়াটা কি খুব জরুরী মা?

প্রশ্নটায় কি নিষেধের সুর? নাকি অনুরোধ? অর্পিতা ঠিক পড়তে পারল না ছেলেকে। অস্পষ্টভাবে মাথা নেড়ে বলল, -সকালেই বেরিয়ে পড়ব। তোরা কাল মাসি-মেসোকে খবরটা দিয়ে দিস। বলিস, মাসি যেন পারলে এসে থাকে এখানে। আমি এক দু'দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

বৃষ্টি ধরেছে। বাইরে শব্দ নেই। ঘরের ভেতরেও অসহ্য নীরবতা। অদূরেই বালিগঞ্জ রেললাইন, তীক্ষ্ম হুইসেল বাজিয়ে চলে গেল একটা ট্রেন। গভীর রাত ছাড়া ওই আওয়াজ এত তীব্র শোনায় না, এখন যেন বাতাস কাঁপাচ্ছে। শব্দ আর নৈঃশব্দে লড়াই চলছে যেন।

অস্বস্তি। বড় অস্বস্তি।

লিভার-টিভারের অসুখ নয়, সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল শুভেন্দুর। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। আক্রমণটা বেশ বড়ই ছিল, শুভেন্দুর ডান অঙ্গ একদমই পড়ে গেছে, বাকশক্তিও লোপ পেয়েছে প্রায়। তবে বেঁচে গেছে এ যাত্রা। কপাল ভাল শুভেন্দুর, অফিসেই ঘটেছিল ঘটনাটা, তার ডেরায় নয়। দিন আষ্টেক আগে ক্যান্টিনে দুপুরের খাওয়া সেরে বাথরুমে গিয়েছিল, সেখানেই হঠাৎ অজ্ঞান, সহকর্মীরাই ধরাধরি করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। অফিসের দু'চারজনের সঙ্গে ডাক্তার মহলে ভালই চেনাজানা, সেই সুবাদে ডাক্তার নার্সদের ভালই মনোযোগ পেয়েছে শুভেন্দু। তবু এখনও তার দশা অকহতব্যই।

এতটা খারাপ অবস্থা অর্পিতা কল্পনাও করেনি। মানুষটা নির্বাক নিষ্কম্প পড়ে আছে, কথা বলতে গেলে শুধু গঁ গঁ জান্তব আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে, অশ্রু গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে। এ দৃশ্য নিরাসক্তভাবে হজম করা কঠিন। অন্তত অর্পিতার এতটা মনের জোর নেই। ভাবা যায়, এই মানুষটাই বেপরোয়া উদ্ধত অমিতাচারী শুভেন্দু সেন? কোন মানুষের যে কখন কী পরিণতি হয়!

হাসপাতালটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। ধুলো ময়লা নেই তেমন, রোগীও বড় একটা গড়াগড়ি খাচ্ছে না মেঝেতে। তবু ওয়ার্ডে কেমন যেন একটা উগ্র গন্ধ। কটু। নিঃশ্বাস আটকে আসে। শুভেন্দুর বিছানার পাশে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল অর্পিতা।

প্যাসেজে রথীন। এখানে আসার পর থেকে রথীন সঙ্গে সঙ্গেই আছে। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, বেঁটেখাটো, গাঁটাগোট্টা, দেখে বেশ দায়িত্বশীল প্রজাতির প্রাণী বলেই মনে হয়।

রথীন এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে বলল, –একই রকম, না?

–হুঁ।

-যাক, ক্রাইসিসটা তো কেটেছে। এতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত।

-আপনাদের খুব ছোটাছুটি গেল ক'দিন।

–পাশাপাশি টেবিলে কাজ করি, এইটুকু তো...।

শুধু ওইটুকুই সম্পর্ক তো? তার বেশি তো নয়? নাকি এও শুভেন্দুর এক স্যাঙাৎ ? মানুষের চেহারা আপাতভাবে যে ধারণা গড়ে দেয় তা কি সব ক্ষেত্রে সঠিক? শুভেন্দুকে দেখে কিংবা তার মোলায়েম কথাবার্তা শুনে কে আন্দাজ করতে পারবে ওই লোক কতটা নোংরা জীবনযাপনে অভ্যস্ত! তা যাই হোক, রথীন খেটেখুটে একটা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, একটু ধন্যবাদ তো তার প্রাপ্যই। অনর্থক কঠিন ব্যবহার করে রথীনের চোখে অর্পিতা ছোট হবে কেন?

বাইরে মেঘলা বিকেল। মলিন আলো। থম মেরে আছে আকাশ। ভিজিটিং আওয়ার চলছে, হাসপাতালের করিডোরে উদ্বিগ্ন মানুষের ঘোরাফেরা। হাসিমুখও দু-চারটে দেখা যায় বটে, তবে তারা যেন এই পরিবেশে বেমানান।

রথীন জিজ্ঞেস করল, –আপনি কি আজ ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন?

অর্পিতা কী বলবে ভেবে পেল না। চুপ করে আছে।

অর্পিতাকে নীরব দেখে রথীন ফের বলল, –অবশ্য কালও আমার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি বলছিলেন আরও দু-চারদিন রাখতে হতে পারে।... কিন্তু তারপর কী হবে?

-মানে?

-রিলিজ হওয়ার পর উনি আসানসোলে থাকবেন কী করে? তখন তো চলবে লংটার্ম ট্রিটমেন্ট। রেগুলার ফিজিওথেরাপি, সেবাশুশ্রূষা, ওষুধবিষুধ খাওয়ানো...

অর্পিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আপনার শুভেন্দুদার সহচরীরা কি নেই এখানে? যাদের ঘরে রাত কাটান আপনাদের শুভেন্দুদা?

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, –হ্যাঁ, সেটা তো একটা ভাবনার কথাই।

-শুভেন্দুদা যে কী...! টাকা পয়সা কিছু নেই। তিন তিনটে লোন চলছে। কেটেকুটে মাইনে যা পান তাও মাসের অর্ধেক না যেতেই...। আপনাকে আর কী বলব, আপনি তো সবই জানেন। গত বছর পি-এফ থেকে নন-রিফান্ডেবল লোন নিয়েছিল, সেগুলোও যে কোথায় গেল?

অতএব অর্পিতা যেন এসে বোঝা কাঁধে তুলে নিক, এই তো বলার উদ্দেশ্য? নিরস স্বরে অর্পিতা জিজ্ঞেস করল, –এখনও পর্যন্ত কত খরচ হল?

-ও নিয়ে ভাববেন না। তেমন বিরাট অ্যামাউন্ট কিছু নয়। ওটা এখনও পর্যন্ত আমরাই চাঁদা তুলে...

ছি ছি ছি, মুখে অত লগচপানি মারা শুভেন্দু সেনের কী হাল! দয়া কুড়িয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে! এর থেকে তো মরে

যাওয়া ভাল।

অর্পিতা মাথা নেড়ে বলল, –না না, আপনারা কেন খরচ করবেন? কত বিল-টিল হয়েছে আমাকে যদি বলেন...

-সে হবে, 'খন ধীরেসুস্থে। আপনার এখন সামনে বিস্তর খরচা ম্যাডাম। ফিজিওথেরাপিতে যদি রেসপন্ড করে, তাহলেও মিনিমাম ছ-আট মাস। প্লাস মেডিসিন।

রথীন ধরেই নিয়েছে বোঝাটা কাঁধে তুলে দিয়েছে অর্পিতার। মলিন হেসে অর্পিতা বলল,

–কিন্তু আমার পক্ষে তো এখন এখানে থাকা সম্ভব নয়।

-থাকবেন কেন? নিয়ে চলে যান। ডাক্তার বাবুকে বলেকয়ে কাল পরশুর মধ্যে রিলিজ করিয়ে দিচ্ছি, সোজা অ্যাম্বুলেন্স করে...

-কিন্তু দু-তিন দিনই বা থাকি কী করে? বাড়িতে সেভাবে তো কিছু বলে আসিনি।

রথীন এবার ঈষৎ চঞ্চল। ভাবছে বোধহয় পাখি পালাচ্ছে। ঝটপট বলে উঠল, –সে তো টেলিফোন করে দিলেই হয়ে যায় ম্যাডাম। আর থাকা? আমার বাড়ি তো আছে। আমার মিসেস মেয়ে, সবাই আছে, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। টাকার চিন্তাও করবেন না। তেমন হলে আমরাই অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া-টাড়া করে.....

-ধন্যবাদ। ওটুকুনি আমার কাছে আছে।

অবিকল কলেপড়া ইঁদুরের মতো বলে উঠল অর্পিতা। দুঃখ উদ্বেগ ছাপিয়ে ঠেলে উঠছে বিরক্তি। আবার হাসিও পাচ্ছে। শুভেন্দু সেন এমন খ্যাতি অর্জন করেছে যে, তার সহকর্মীরা মানে মানে তাকে পাচার করে দিতে পারলে নিষ্কৃতি পায়। অবশ্য হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ তাও সম্ভব, কিন্তু এমন একটা ভেজিটেবল বনে যাওয়া রোগীর ম্যাও কে-ইবা সামলাতে চাইবে!

রথীন মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, –তাহলে আমার বাড়িতে আসছেন তো ম্যাডাম?

অর্পিতা দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল। স্পষ্ট গলায় বলল, –না । থাকলে আমি শুভেন্দুর বাড়িতেই থাকব।

রথীন ঢোক গিলে বলল, –কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, শুভেন্দুদার বাড়িতে আপনি থাকতে পারবেন না।

কেন শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়েও গিলে নিল অর্পিতা। শুভেন্দুর সেনের বাড়িতে শুভেন্দু সেনের স্ত্রী কেন থাকতে পারবে না, এটা অর্পিতার চেয়ে আর কে বেশি জানে! তবু একরকম জেদ করেই অর্পিতা বলল, –একটা রাত ঠিক কাটিয়ে দেব। আপনি প্লিজ দেখুন কালকেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

রথীন পৌঁছে দিয়ে গেল শুভেন্দুর ডেরায়। পাড়াটা যেন কেমন কেমন, বস্তি বস্তি ধরনের। এরকম পরিবেশই শুভেন্দুর বেশি প্রিয়, অর্পিতা জানে। একখানা মাত্র ঘর, চারদিকে আরও দশটা ভাড়াটে, চেহারা দেখে কাউকেই সমপর্যায়ের মানুষ বলে মনে হয় না, প্রচুর ক্যালরব্যারল, চিৎকার চেঁচামেচি। সঙ্গে একটা বোঁটকা গন্ধও। ব্যারাক ব্যারাক বাড়িটার শেষ প্রান্তে গোটাতিনেক পায়খানা বাথরুম, সব ভাড়াটেরই ব্যবহার্য। উঁকিঝুঁকি মারছে চতুর্দিকের লোকজন। শুভেন্দুর আসল বউ দেখছে সবাই।

অর্পিতার গা ঘিনঘিন করছিল। এই পরিবেশে সে এক ঘণ্টাও বাস করবে কী করে? রথীনের কথা শোনাই উচিত ছিল।

শুভেন্দুর ঘরখানা বাহুল্যবর্জিত। নিরাভরণ নয়, প্রায় নিরারণই বলা যায়। আছে মাত্র একটা পাতলা তোষক পাতা চৌকি, মিটসেফ, চেয়ার-টেবিল, ট্রাংক আর একখানা সস্তার আলনা। লুঙ্গি পাঞ্জাবি আর গামছা ঝুলছে আলনায়। কোণে একটা গেলাস ঢাকা মাটির কুঁজো। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার, ছোট্ট আয়না। ক্যালেন্ডারের অর্ধনগ্ন নারী শুভেন্দুর রুচি বহন করছে।

তেষ্টা পাচ্ছিল অর্পিতার। জোর করে রথীন রুটি–কষা মাংস খাইয়ে দিয়েছে, চোরা অম্বলে জ্বলছে গলা, জিভ শুকিয়ে খরখর। কুজোতে জল আছে কিনা দেখবে? ম্যাগো: খেলেই বমি হয়ে যাবে। বাইরে বেরিয়ে কিনে

আনবে জলের বোতল? দিদিকেও একটা ফোন করে এলে হয়।

দরজা খোলা রেখেই অর্পিতা বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকার গাঢ় এখন, পাড়াটাও বেশ অনুজ্জ্বল, গা ছমছম করছে অল্প অল্প। অজানা অচেনা জায়গায় এভাবে একা রাত্রিবাস জীবনে এই প্রথম। নাহ, রথীনের বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত ছিল। সেখানেও অবশ্য রথীনের স্ত্রী মেয়ের করুণাভেজা দৃষ্টি সহ্য করতে হত।

তা হোক, তবু এর থেকে তো ভাল।

পানের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা কোল্ডড্রিংক খেল অর্পিতা। জল কিনল এক বোতল নয়, দু' বোতল। তারপর খানিকটা হেঁটে এক এসটিডি বুথে ঢুকেছে।

জামাই বাবু ধরেছে ফোন। –কী ব্যাপার, তুমি এভাবে দুম করে চলে গেলে কেন?

-গিয়ে সব বলব। দিদি কোথায়?

-দিদি তো তোমার বাড়িতে।.... কী হয়েছে শুভেন্দুর?

যেটুকু বলার অতি সংক্ষেপে বলল অর্পিতা।

জামাই বাবু গজগজ করছে, –তোমার আমাকে বলা উচিত ছিল। সঙ্গে যেতে পারতাম।

-যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, কাজের কথা শুনুন। কাল দুপুর নাগাদ অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে বেরোব। পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। পারলে থাকবেন। আর হ্যাঁ, লাল্টুকে বলবেন ছোট ঘরটা ফাঁকা করে রাখতে। ঠিক আছে?

ঘরে ফিরে ভাল করে দরজা বন্ধ করল অর্পিতা। আলো না নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুঁজে হাতড়াচ্ছে স্মৃতি। একটা ভাল ছবিও মনে পড়ে না। বিয়ের পর বছর দুয়েক তাও ঘরোয়া, সংসারী ছিল শুভেন্দু, কিন্তু সেই সময়টা যেন বেবাক মুছে গেছে মস্তিষ্কের কোষ থেকে। হ্যাঁ, একটা ছবি মনে আছে। লাল্টু হওয়ার পর নার্সিংহোমে একটা ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছিল শুভেন্দু। অনেক ধরনের ফুল ছিল তোড়াটায়। গোলাপ, রজনীগন্ধা, অ্যাস্টর, কলাবর্তা, চন্দ্র মল্লিকা...। ঘরভর্তি লোক, ফুলটা বিছানার পাশে রেখে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু মিটিমিটি হাসছিল।

তার কিছুকাল পর থেকেই তো প্রস্ফুটিত হল শুভেন্দু। স্বামী স্ত্রী দু'জনই বেরিয়ে যায় কাজে, বাচ্চার জন্য আয়া রাখা হয়েছে... অফিসে গা ম্যাজম্যাজ করছিল অর্পিতার, হাফডে সিএল নিয়ে বাড়ি চলে এল.... ঘরে ঢুকতেই অভাবনীয় দৃশ্য! লাল্টু খাটে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, মেঝেয় বছর পঁয়ত্রিশের আয়াটার সঙ্গে আদিম খেলায় মেতেছে শুভেন্দু...। এই ক্ষয়াটে আধবুড়িটার সঙ্গে শুভেন্দু, টগবগে জোয়ান শুভেন্দু শুতে পারে... অর্পিতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। আশ্চর্য, শুভেন্দু যখন হাতেপায়ে ধরে বলল, মহিলা তাকে একা ঘরে পেয়ে ফুঁসলেছে, সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি.... অর্পিতাও বিশ্বাস করে নিয়েছিল। কী বোকা ছিল অর্পিতা!

তারপর থেকে ঘরে আর মেয়ে মানুষ নিয়ে বেচালপনা করেনি শুভেন্দু; শুরু করল মদ গেলা। দামী বিদেশী সুরা নয়, তাড়ি চুল্লু। দিশি মদ খেয়ে পথেঘাটে গড়াচ্ছে, লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছে অর্পিতার। রেললাইনের ধারে বস্তিতে যাওয়া শুরু করল... ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, অশিক্ষিত কুলিকামিন ঝি শ্রেণীর মেয়েছেলেদের ওপর তার তীব্র আকর্ষণ।

অর্পিতা শোধরানোর চেষ্টা করেছে কত। ঝগড়া করেছে, গালিগালাজ করেছে, রাগ করে মার কাছে চলে গেছে, ভাসুর ননদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করেছে...। অর্পিতা খুব বেশি প্রতিবাদী হয়ে গেলে ক'দিন হয়তো সংযত থাকে, আবার যে কে সেই। নিজের মাইনে তো উবেই যাচ্ছে, টানাটানি করছে অর্পিতার টাকা কড়ি নিয়েও। একবার তো অর্পিতার গোটা মাইনের টাকাটা লোপাট করে বাবু ফুর্তি করতে চলে গেল দার্জিলিং। অর্পিতার মাথায় হাত। নোংরা পাড়া থেকে শুভেন্দুকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ, স্বামীকে ছাড়াতে রাত দুপুরে অর্পিতাকে ছুটতে হল থানায়। আরও আছে, আরও আছে। বস্তিতে একটা চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি

করছিল, বস্তির ছেলেরা এসে বাড়ি চড়াও হল। বের করে দিন হারামজাদাকে, ও শালাকে আজ জ্যান্ত পুঁতব! শুভেন্দু তখন লুকিয়ে আছে খাটের তলায়, কেন্নো পোকার মতো।

এর পরও তো শুভেন্দুর সঙ্গে বাস করেছে অর্পিতা। কেন যে করেছে? যেদিন ওই আয়ার সঙ্গে দেখে ফেলেছিল, সেদিনই কি শুভেন্দুকে পরিত্যাগ করা উচিত ছিল না? এক-আধটা বছর তো নয়। সাত সাতটা বছর এই লম্পটের সঙ্গে পড়ে রইল কেন?

হায় রে, সব কেন'র উত্তর যদি থাকত পৃথিবীতে! মানুষের হৃদয় কি সবসময় যুক্তিবুদ্ধি মেনে চলে? ভালোবাসা বড় বিচিত্র অনুভূতি, স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে গুলিয়ে দেয়। নইলে লেখাপড়া জানা, চাকরি-বাকরি করা মেয়ে অর্পিতা মাদুলি তাবিজ কবচ বশীকরণকে তখন আশ্রয় বলে আঁকড়ে ধরে? কোথায় না ছুটেছে শুভেন্দুর মতি ফেরানোর জন্য। ওমুক বলল তমুক জায়গায় কে নাকি অব্যর্থ শিকড় দেয়, শুভেন্দুর বালিশের তলায় রেখে দিলেই কেললা ফতে। অফিস কামাই করে অর্পিতা ছুটল সেখানে। বশীকরণ তাবিজ আনতে চম্পাহাটি যাচ্ছে, তো সিদ্ধ মাদুলির আশায় মধ্যমগ্রাম।

কী লাভ হল? মতি তো ফিরলই না, একসঙ্গে থাকার ফলে বুবলি এসে গেল পেটে।

শেষে শুভেন্দুই একদিন মুক্তি দিল অর্পিতাকে। বদলি নিয়ে চলে গেল রাঁচি। সেখানে থেকে রানিগঞ্জ, তারপর এই আসানসোল। খবর না রাখতে চাইলেও কিছু কিছু উড়ো খবর তো কানে এসেছেই অর্পিতার। কুলিকামিনদের বস্তিতে গিয়ে পড়ে থাকে, ধেনো গিলে ক্যাঁকলাসের মতো চেহারা হয়েছে, অফিসও করে না নিয়মিত...। আশ্চর্য, ছেলেমেয়ে দুটোর ওপরও এতটুকু টান নেই লোকটার?

বন্ধ দরজার ওপার থেকে একটা তীক্ষ্ম ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছে। সরু মেয়েলি কান্না। মত্ত পুরুষের গর্জনও যেন শোনা যায়। মারধোর চলছে নাকি? শুভেন্দুর অবশ্য একটা গুণ ছিল, কখনও গায়ে হাত তোলেনি। অর্পিতা আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করত, মাতাল হয়ে অশ্লীল খিস্তির ফোয়ারা ছোটাত, তবু...

পাশে ফিরে একহাতে কান চাপল অর্পিতা। ওইটুকু পুণ্যের জন্যই কি মানুষটার প্রাণ ধুঁকপুক করছে এখনও? নাকি পাপের কারণেই জীবন্মৃত হয়ে থাকার সাজা দিচ্ছেন ঈশ্বর? মা বলল, ইহলোকের পাপের বেতন ইহলোকেই চুকিয়ে যেতে হয়।

ওই মানুষটার সেবা শুশ্রূষা করাটাও কি এক ধরনের শাস্তি? কোন পাপে সেই সাজা পাবে অর্পিতা? ভালবাসার?

বিছানা পাতাই ছিল। ছোট ঘরের তক্তপোষে। অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো স্ট্রেচারে চাপিয়ে শুভেন্দুকে শুইয়ে দিয়ে গেল।

একটু আগে ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছিল শুভেন্দু। বোবা দৃষ্টি। এখন বিছানায় চোখ বুঁজেছে। আসানসোল থেকে কলকাতা কম দূর নয়, দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে অশক্ত মানুষটা বেশ কাহিল।

বহুকাল পর বাড়ি ফিরে কি নিশ্চিত বোধ করল শুভেন্দু? নাকি সংকোচ জেগেছে?

এই মুহূর্তে অবশ্য কিছুই বোঝার উপায় নেই। শুধু তার নিঃশ্বাসের চঞ্চল ওঠাপড়া জানান দেয়, ভেতরে তার চাপা আলোড়ন চলছে একটা।

অর্পিতাও আর পারছিল না। বসার জায়গায় পাতা বেতের চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়েছে। চুল উসকো খুশকো, মুখ যেন কালিলেপা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, কোমরে পিঠে অসহ্য যন্ত্রণা। দুটো দিন পুরো হয়নি, এর মধ্যেই যেন এক জীবনের অবসাদ জমে গেল শরীরে।

বুবলি লাল্টু তফাতে দাঁড়িয়ে। নন্দিতাও। কারুর মুখে শব্দটি নেই, আড়ে আড়ে দেখছে অর্পিতাকে। অমল অ্যাম্বুলেন্সটাকে ছাড়তে গিয়েছিল, ফিরে রোগীর ঘরে ঢুকেছে। বেরিয়ে একটুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করল, – ওখান থেকে বেরিয়েছে কখন?

অর্পিতা কপাল টিপল, – সাড়ে বারোটা নাগাদ।

-এতক্ষণ লাগল? প্রায় ন'ঘণ্টা?

-হাইওয়েতে লরির জ্যাম ছিল খুব। ওখানেই প্রায় ঘণ্টা দুয়েক.... তার ওপর গোটা রাস্তা জল কাদা বৃষ্টি... উফ, যা গেল!

নন্দিতা এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়েছে। জিজ্ঞেস করল, চা খাবি?

-কর একটু।

রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল নন্দিতা। শুকনো গলায় প্রশ্ন করল, শুভেন্দুকে এখন কী দেওয়া হবে?

–পথে হরলিক্স খেয়েছে। খানিক আগে। এরপর একেবারে ভাত।

–ভাত খাচ্ছে?

-গলা গলা। অর্পিতার স্বর ক্লান্ত, জবাব নির্লিপ্ত, ডাক্তার বলছিল সবজি টবজি সেদ্ধ দেওয়া যেতে পারে। কিংবা স্যুপ, স্টু...

-ও। নন্দিতা রান্নাঘরে চলে গেল। সামান্য গলা উঠিয়ে বলল, আমি কিন্তু ওর জন্য কিছু করিনি। কী খাবে, না খাবে... বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে।

অর্পিতা উত্তর দিল না। ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল।

অমল চেয়ার টেনে বসেছে। থুতনিতে হাত রেখে বলল, কী কন্ডিশান এখন?

-কথা বলার ক্ষমতা নেই। ডান হাতটাও তুলতে পারছে না। ডাক্তার বলছিল, সময় লাগবে।

-তার মানে তোমার ঘাড়েই এসে পড়ল?

-আমার কপাল।

লাল্টু ফস করে বলে উঠল, – আমি জেঠু পিসিদের জানিয়ে দিয়েছি। কাল পরশু হয়তো আসবে।

-আমার মাথা কিনবে। অর্পিতা বিড়বিড় করল, সোহাগ দেখিয়ে কেটে পড়বে, দায় কেউ নেবে না।... তাড়াহুড়ো করে খবর দেওয়ার কী দরকার ছিল?

-না হলে তো তুমিই বলতে...। তোমার মনের কথা বুঝব কী করে?

লাল্টুর গলায় স্পষ্ট অসন্তোষ। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। লোকটা তো ছেলেমেয়ের একফোঁটা শ্রদ্ধাও অর্জন করতে পারেনি কোনও দিন। বাবাকে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তে ওরা যে অখুশি হবে, এতো জানা কথাই। কিন্তু অর্পিতারও যে এছাড়া কোনও উপায় ছিল না, এটাও তো লাল্টুর বোঝা উচিত।

অর্পিতা কিছু বলার আগে অমলের কথায় প্রসঙ্গ ঘুরে গেল, – এখানে কোন ডাক্তারকে দেখাবে কিছু ঠিক করেছ?

–ভাবছি।

–এখন তো নিউরোলজিস্ট দরকার?

-ওখানকার ডাক্তার দু'জনের নাম সাজেস্ট করে দিল। দেখি কাকে সুবিধে হয়। ফিজিওথেরাপিস্টেরও তো খোঁজ করতে হবে।

-তোমাদের বাসস্ট্যান্ডে একটা ফিজিওথেরাপির সেন্টার আছে না?

-হ্যাঁ। কাল যাবক্ষণ।

-মান্থলি বন্দোবস্তের চেষ্টা কোরো। খরচটা কম হবে।

–শুনেছি অনেকে নাকি প্রাইভেটেও করে। তাদের চার্জও কম।... আপনার এমন কেউ চেনাজানা আছে?

অমল কপাল কুঁচকে ভাবল একটু। বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও। আমার অফিসের এক ভদ্রলোকের মার কিছুদিন আগে সেরিব্রাল হয়েছিল... দেখি কালই আমি...

-খরচ কন্ট্রোলে না রাখতে পারলে আমি অকূল পাথারে পড়ে যাব।

-সে তো বটেই।... ডাক্তার কী বলছে? এখন ক'বার করে ম্যাসাজ?

–মিনিমাম দু'বার তো বটেই। তারপর হয়তো...

মনে মনে অর্পিতা বলল, হাতি পোষার খরচ। ভাবল জামাই বাবুকে একবার বলে শুভেন্দুর একটি পয়সাও নেই, এবার আমারই সর্বস্ব নিংড়ে নেবে লোকটা। বলল না। থাক গে, ছেলেমেয়েরা এমনিই তেতে আছে, ওদের সামনে এক্ষুণি কাদা নাইবা ঘাঁটল।

নন্দিতা চা-বিস্কুট এনেছে। টেবিলে কাপ-প্লেট রাখতে রাখতে বলল, কাল রাত্তিরে ছিলি কোথায়?

পলকের জন্য নরকের ছবিটাকে দেখতে পেল অর্পিতা। খাটের তলায় মদের বোতলের ডাঁই, তোষকের তলায় নোংরা বই... বাহান্ন বছর বয়সেও কী হীন জীবনযাপন করত লোকটা!

এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল, ছিলাম কোথাও একটা।

-এক রাত্তিরেই কী চেহারা বানিয়েছিস আয়নায় গিয়ে দ্যাখ।

-হুঁ।

-যা, উঠে মুখ-টুখ ধো। ফ্রেশ হয়ে নে।

-দাঁড়া, এখন দুটো ওষুধ আছে, দিয়ে আসি আগে।

অর্পিতা ওঠার আগেই দরজায় করাঘাত। খুলতেই কমলা হুড়মুড় ঢুকে পড়েছে, কী হয়েছে গো শুভেন্দু বাবুর? অ্যাম্বুলেন্স চড়ে কোথা থেকে নিয়ে এলে?

এই সময়ে উটকো উৎপাত ভাল লাগে? তবু যথাসম্ভব শান্ত মুখে শুভেন্দু সমাচার পেশ করল অর্পিতা। শুনেই তৃপ্ত নয়, কমলা উঁকিও দিয়ে এল ছোট ঘরে। তারপর শুরু হয়েছে লক্ষ প্রশ্নবাণ। জবাব দিতে দিতে অর্পিতা জেরবার।

নন্দিতাই উদ্ধার করল। কমলাকে থামিয়ে বলে উঠল, আমরা এবার চলিরে অপু। তুই খুব টায়ার্ড, গিয়ে শুয়ে পড়।

ইঙ্গিত বুঝে কমলাও কেটে পড়েছে মানে মানে।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর লাল্টু দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। বুবলি গটগট ঢুকে গেল রান্নাঘরে। প্রেসার কুকারে ভাত বসিয়ে গিয়েছিল নন্দিতা, ঢাকা খুলছে কুকারের। সশব্দে।

ছেলেমেয়ের চাপা বিরুদ্ধ ভাব টের পাচ্ছিল অর্পিতা। কখনও শব্দে, কখনও নৈঃশব্দে। তবে এই মুহূর্তে ঘাঁটাল না তাদের, ভাল করে হাতটাত ধুয়ে গেছে শুভেন্দুর কাছে। চোখ বুঁজেই পড়ে আছে লোকটা। গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মুখ অল্প হাঁ, লালা গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। এই লোকই কি সেই লোক, যে উচ্ছৃঙ্খল দাপটে চলে গিয়েছিল একদিন?

অর্পিতা ধীরপায়ে শুভেন্দুর মাথার পাশে গেল, এই যে শুনছ? এই যে?

চোখের পাতা সামান্য খুলেছে শুভেন্দু। গলায় শব্দ, অঁ অঁ অঁ অঁ...

অস্বস্তিকর আওয়াজ। গোটা রাস্তাই এই আওয়াজ শুনতে হয়েছে অর্পিতাকে, তবু এখনও কান যেন অভ্যস্ত হয়নি।

ঘাড়ে হাত রেখে শুভেন্দুর মাথাটা সাবধানে তুলল অর্পিতা। একটা ক্যাপসুল মুখে গুঁজে দিয়ে জল খাওয়াল সতর্কভাবে। যান্ত্রিক স্বরে বলল, গিলে নাও।

গিলেছে। মাথা বালিশে নামিয়ে দিল অর্পিতা। এটুকু পরিশ্রমেই শুভেন্দু হাঁপিয়ে গেছে, দম নিচ্ছে জোরে জোরে।

বুবলির গলা শুনতে পেল অর্পিতা, গলা ভাত কি এখন দেব?

শুভেন্দুকেই দেখতে দেখতে অর্পিতা সরে আসছিল, থমকে গেল। আবার গঁ গঁ করছে লোকটা।

- কী হল?

–অঁ অঁ অঁ অঁ...

-কী বলছ? কী চাই?

নিষ্প্রাণ চোখ দুটো অধীর সহসা। গলায় শব্দটা রেখেই বাঁ হাত তুলেছে শুভেন্দু। কী দেখায়? চাইছেই বা কী? অর্পিতা ঘরে বসে থাকুক? নাকি বুবলি লাল্টুকে দেখতে চাইছে? ছেলেমেয়ে একটিবারের তরেও সামনে আসেনি, সেই জন্যই কি এই চাঞ্চল্য?

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল অর্পিতা, বুবলি লাল্টু পরে আসবে। এখন শুয়ে থাকো। চুপচাপ।

উৎকট গোঙানি থেমে গেল। উত্তেজিত হাতখানাও ঝপ করে নেমে গেছে। চোখ বুঁজল শুভেন্দু।

কী মানুষে, কী যে হাল হয়! বিকৃত কামনার তাড়নায় কখনও ছেলেমেয়েকে স্মরণ পর্যন্ত করেনি, আজ গাড্ডায় পড়ে... হাসিও পায়!

বেরিয়ে এসে অর্পিতা বুবলিকে বলল, একটা প্লেটে দু'হাতা ভাত বাড়। জুড়োক। খাওয়াতে সময় লাগবে, আগে আমরা সেরে নিই।

বুবলি সাড়াশব্দ করল না। ফের ঘটাং ঘটাং বাসন বাজাচ্ছে। পাথর মুখে টিভি দেখছে লাল্টু, ভলিউম একদম কমিয়ে।

বাথরুমে ঢুকে অর্পিতা দেখল চৌবাচ্চায় আজ জল টলটল। পাম্প সারানো হয়ে গেল? নাকি ভারী দিয়ে নেওয়া হয়েছে? জলে হাত ছোঁয়াল একবার। আহ, কী ঠান্ডা। গায়ে একটু ঢাললে হয়। সেই কাল দুপুর থেকে এত ক্লেদ জমেছে শরীরে। থাক, রাত হল, ছেলেমেয়ে দুটো তার জন্য অপেক্ষা করছে, বরং শোওয়ার আগে ভাল করে ধুয়ে নেবে দেহটাকে। তাছাড়া এতক্ষণ ক্ষিধে তেষ্টার বোধ ছিল না, এবার জঠরও হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে।

ঘাড়ে মুখে খানিক জল ছিটিয়ে অর্পিতা সটান খাবার টেবিলে। থালা সাজিয়ে বসে ছিল ছেলেমেয়ে, অপাঙ্গে দেখল দু'জনকে। পরিবেশ সহজ করার জন্য উচ্ছ্বল হল একটু, –কে রাঁধল আজ? দিদি? না মালতীর মা?

–মাসিমনি। বুবলির সংক্ষিপ্ত জবাব।

–তোদের কোনও অসুবিধে হয়নি নিশ্চয়ই?

উত্তর নেই।

–ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসেছিল আজ? ছোটঘরের রেগুলেটার ঠিক হয়েছে?

–হুঁ। লাল্টু চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, –আমি কোন ঘরে শোব?

–ছোটঘরে কি শুতে পারবি তুই? রাত্তিরে উঠতে হবে বারবার। বেড প্যান দেওয়া, জলটল খাওয়ানো...

–স্ট্রেঞ্জ! এসব আমায় বলছ কেন? আমি যা জানতে চেয়েছি তার শুধু উত্তর দাও।

নন্দিতা মুরগি রেঁধে গেছে। রুটির টুকরো ঝোলে ডোবাতে ডোবাতে ছেলের উষ্মা হুজম করল অর্পিতা। তারপর শান্ত গলায় বলল, তোরা মনে হচ্ছে খুব রেগে আছিস?

লাল্টু গুমগুমে গলায় বলল, আমাদের কি এখন নাচা উচিত?

–দ্যাখ, তোরা কেউ ছোটটি নেই। তোদের সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা হওয়াই ভাল। অর্পিতা মুখ তুলল, –তোর বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা ছিল না, সে আলাদা থাকত। আমার ওপর সে কীরকম অত্যাচার করেছে, তাও তোরা কিছু কিছু জানিস। বাবা হিসেবেও ওই লোকটা তোদের প্রতি কোনও কর্তব্য পালন করেনি, এসবও তোদের অজানা নয়।... তা সত্ত্বেও একটা কথা বলি। লোকটা আজ চরম বিপাকে পড়েছে, আমরা ছাড়া কেউ তাকে দেখার নেই। আত্মীয়তা, বন্ধন, সম্পর্ক, এসব নাই থাক, মানবিকতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। আমি ওকে ফেলে দিই কী করে বল?

–সে তোমার দয়ার প্রাণ, তুমি দয়া দেখাতে পারো। লাল্টু গরগর করে উঠল, কিন্তু আমরা তাতে খুশি হব, এ তুমি ভাবলে কী করে?

বুবলি ঝুপ করে বলে উঠল, আমরা তো বুঝতে পারছি না শুনেই তুমি দৌড়ে গেলে কেন?

–একটা লোক মরে যাচ্ছে শুনেও নির্বিকার বসে থাকব?

–কেন থাকবে না? ও আমাদের কে?

কথাটা তীরের মতো বিঁধল অর্পিতাকে। বাবাকে এত ঘৃণা করাও কি ছেলেমেয়ের জন্য মঙ্গলজনক? এর থেকেই তো নানান মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। বাবা-মাকে ভালবাসতে না পারাটা ছেলেমেয়ের পক্ষে কি যন্ত্রণাদায়ক নয়?

অর্পিতা শক্ত গলায় বলল, ছি বুবলি, ওভাবে বলে না। সে যেমনই হোক, তবু তো তোমাদের বাবা।

–আমি মানি না।

–না মানলেও সে তোমাদের বাবা। আমার সঙ্গে রিলেশান ছিঁড়ে গেলেও তোমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা তার একটা থেকেই যায়। আজ যদি সে মরে যেত, তার শেষ কাজটাও তোমাদেরই করতে হত!

বুবলি আচমকা ফুঁপিয়ে উঠেছে। লাল্টু মুখ গোঁজ করে বসে।

অর্পিতার বুকটা ব্যথিয়ে উঠল। আহা রে, কী তীব্র অভিমান জমে আছে ছেলেমেয়ে দুটোর মনে। চার বছর বয়সের পর থেকে বাবাকে তো আর দেখেইনি বুবলি। লাল্টুর কাছেও বাবার যেটুকু স্মৃতি আছে তা মোটেই সুখকর নয়। নাহ, বরফ গলতে সময় লাগবে।

অর্পিতা মেয়ের মাথায় হাত রাখল, শান্ত হ। ঠিক আছে, মনে কর না আমার কোনও চেনা লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে আমি এনে রেখেছি। একটু মানিয়ে গুনিয়ে নিতে পারবি না?

লাল্টু টেরিয়ে একবার বোনকে দেখল, একবার মাকে। ভারিক্কি গলায় বলল,

–সুস্থ হলে চলে যাবে তো?

–একটু সময় দে।... যাক গে, খেয়ে উঠে শোওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করে ফ্যাল। বড় ঘরের ডিভানে তুই বিছানা করে নে, বোন আমার খাটে শুক। আমি একটু তোষক নিয়ে ছোটঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়ব।

–তোমার ঠান্ডা লাগবে না?

–ধুস, গরমকাল তো। মাটিতেই আরাম বেশি।

লাল্টু বুবলি চোখ চাওয়া চাওয়ি করল। তবে আর তর্কে গেল না। নিঃশব্দে খাচ্ছে।

আঁচিয়ে উঠে গলা ভাতের থালা নিয়ে অর্পিতা ফের ছোটঘরে। শুভেন্দু ঘুমিয়ে পড়েছে, ডেকে সাড়া পাওয়া গেল না, তুলতে হল আলগা ঠেলে। অসুস্থ চোখে আবার সেই ভাষাহীন দৃষ্টি। নুনবিহীন বিস্বাদ ফ্যানা ভাত চামচে করে খাইয়ে দিচ্ছে অর্পিতা, তামসিক রুচির শুভেন্দু বুভুক্ষর মতো তাই খাচ্ছে। শুয়ে শুয়েই। নির্ঘাৎ খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, পাঁচ মিনিটে প্লেট সাফ।

অর্পিতা নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, আর খাবে?

অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল শুভেন্দু। চোখ পিটপিট করছে।

–পেট ভরেছে?

–অঁ অঁ অঁ অঁ...

নিপুণ সেবিকার মতো শুভেন্দুর মুখ মুছিয়ে দিল অর্পিতা। জল খাওয়াল সামান্য। রাতের একটা ওষুধও। বলল, এবার ঘুমোও।

থালা হাতে অর্পিতা উঠতে যাবে, হঠাৎ বাঁ হাতে অর্পিতার হাতটা ধরেছে শুভেন্দু।

–আবার কী হল?

শুভেন্দুর প্রায় অবশ মুখে ভাঙচুর চলছে। চোখ ভরে এল জলে। গোঙানিটা কান্নার মতো হয়ে গেল কেমন। বাঁ হাত ছোঁয়াচ্ছে কপালে।

ক্ষমা চাইছে! ক্ষমা চাইছে!

বাইরে সহসা ঝমঝম বৃষ্টি। অর্পিতার বুকের গভীরেও ভেজা বাতাস। বর্ষা নেমেছে।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি বিদায় নিল বর্ষা।

এ বছর আকাশ খেল দেখিয়েছে খুব। টানা দেড় মাস সূর্যকে ধারে-কাছে ঘেঁষতেই দেয়নি। সারাক্ষণ চরাচরে ঘনঘোর, হয় ঝিরঝির ঝরছে, নয় নামছে মুষল ধারায়। মাঝে সাত-আট দিন তো মহানগর জলে থৈ থৈ। স্কুল-কলেজে রেনি–ডে, পথে প্রায় যানবাহন নেইই। অফিস যাত্রীরা চূড়ান্ত নাকাল।

অর্পিতারও কম হয়রানি গেল না। একে ঘরে প্রায় অথর্ব রোগী, তার পরিচর্যা করো, নিয়মিত ফিজিওথেরাপি করাও, ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাওয়াও, তার সঙ্গে জলকাদা ঠেঙিয়ে ডাক্তারের কাছে ছোটো রে, অফিস দৌড়োও রে....। প্রথমটা দিন দশেকের ছুটি নিয়েছিল অর্পিতা, একা হাতে সামলাচ্ছিল রোগীকে। কিন্তু এ অসুখ তো দু'দশ দিনে সারার নয়, তদ্দিন বাড়ি বসে থাকলে অর্পিতার চলবে? মরিয়া হয়ে তাই একটা আয়া রেখে দিল। দিনের বেলার জন্যে। অন্য সময় হলে শুভেন্দুর জন্য আয়ার ব্যবস্থা মানে বিপদ ডেকে আনা, তবে এখন তো সে নখদন্তহীন, এখন আর চিন্তা কিসের!

মাত্র দু'আড়াই মাসে বেশ ভালই উন্নতি হয়েছে শুভেন্দুর। ওষুধ আর ফিজিওথেরাপির গুণে মাসখানেকের মধ্যে ডান অঙ্গে সাড় ফিরে এল, বুলিও ফুটে গেল মুখে। এখন সে ঘরের মধ্যে অল্প অল্প হাঁটা-চলা করছে। ডান পায়ে জোর পায় না অবশ্য, চলতে গেলে কারুর না কারুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। লাঠি নিয়ে হাঁটতে গেলে টলমল করে।

বুবলি লাল্টু প্রথম ক'দিন বাবার থেকে দূরে দূরেই ছিল। বড় জোর ছোটঘরের দরজায় একবার উঁকি দিয়ে এল, ব্যাস, পারতপক্ষে কাছে ঘেঁষত না। একটু একটু করে বদলালো পরিস্থিতি। একদিন রাতে অর্পিতা রান্নাঘরে রুটি সেঁকছিল, বসার জায়গাতেই বইখাতা উল্টোচ্ছিল লাল্টু, হঠাৎই ছোটঘরে চাপা আর্তনাদ। অর্পিতা শুনতে পায়নি, লাল্টু উঠে গিয়ে দেখে বিছানা থেকে অর্ধেক ঝুলছে শুভেন্দু। ডানদিক তখনও নাড়াচাড়া

করতে পারে না, বাঁ হাতে খামচে ধরে আছে তোষক। শুভেন্দুকে তুলে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছিল লাল্টু। মুখ খানিক গোমড়া হয়ে গিয়েছিল বটে, তবে তার পর থেকে বাবার ওপর তার বুঝি একটু মায়াও জেগে গেল। এখন পড়তে বসুক, কি টিভিই দেখুক, লাল্টুর কান সজাগ থাকে, মৃদু শব্দ হলেই ছোট ঘরটা দেখে আসে একবার। কখনও মনে হয় বাবা উঠতে চাইছে, বালিশ জড়ো করে তাকে আধবসার মতো করে দেয়, চোখ কুঁচকে জরিপ করে লোকটা আরও কিছু বলতে চাইছে কিনা। যেচে ওষুধপত্র এনে দিচ্ছে শুভেন্দুর, ফিজিওথেরাপিস্টের সঙ্গে কথা বলছে...। যেদিন প্রথম শুভেন্দুকে হাঁটানো হল, লাল্টুই নড়া চেপে ধরে রেখেছিল বাবার।

দাদার দেখাদেখি বুবলিও এখন শুভেন্দুর ওপর সদয়। মাঝে মাঝে বাবার পাশে গিয়ে বসে, কখনও কখনও ওষুধ খাইয়ে দেয়। শুভেন্দু তার মুখের পানে এক অদ্ভুত মায়ামাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বুবলি বুঝি উপভোগ করে দৃষ্টিটাও। একদিন আয়া ডুব মারল, অর্পিতার মাথায় হাত, আবার একদিন অফিস কামাই হবে.... বুবলিই অভয় দিল, তুমি যাও মা, আমি একটা দিন ঠিক সামলে দেব। সামলেছেও। দক্ষ নার্সের মতো খাইয়েছে দাইয়েছে, চোখে চোখে রেখেছে..... অর্পিতা যখন অফিস থেকে ফিরল, তখন তো রীতিমত গল্প করছে বাবার সঙ্গে। বুবলিও বলছে, শুভেন্দু শুনছে হাসি হাসি মুখে।

ছেলেমেয়ের এই পরিবর্তনে অর্পিতা খুশিই। কিংবা বলা যায় স্বস্তি পেয়েছে মনে মনে। বুবলি লাল্টু অসহযোগিতা করলে অর্পিতার পক্ষে শুভেন্দুর সেবা করা কঠিন হত।

শুধু কি বুবলি লাল্টুই বদলেছে? শুভেন্দুর প্রতি অর্পিতারই বা সেই বিরাগ এখন কোথায়! মানুষটা এখন একেবারে পরাজিত, বিধ্বস্ত, অসহায়ের মতো অর্পিতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে বার বার– এমন অবস্থায় কাঁহাতক আর পুরোন ঘৃণাটাকে জিইয়ে রাখা যায়? উল্টে যেন ভালবাসার মরা খাতে একটু একটু করে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে। অর্পিতার অজান্তেই। লোকটা যখন তখন হঠাৎ হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে, গভীর চোখে তাকিয়ে থাকে, গা শিরশির করে ওঠে অর্পিতার। শুভেন্দু যেন নতুন করে তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার অস্তিত্বে। কান্না পায় অর্পিতার। এই উত্তাপটুকুর জন্য এক সময়ে কী কাঙালপনটাই না করেছে সে।

আজও শুভেন্দুর কথা ভাবছিল অর্পিতা। অফিসে বসে। অবশ্য ভালবাসার কথা নয়, কেজো ভাবনা। শুভেন্দুকে কলকাতায় নিয়ে আসার পর রথীনকে সে একবার ফোন করেছিল, শুভেন্দু মাইনেকড়ি পাবে কিনা, পেলে কীভাবে সেটা তোলা যেতে পারে, এসব ব্যাপারে রথীনের পরামর্শ মতোই অথোরাইজেশান লেটার পাঠিয়ে দিয়েছিল, সঙ্গে মেডিকেল সার্টিফিকেটসহ ছুটির দরখাস্ত। জলের মতো পয়সা খরচ হয়ে যাচ্ছে, বৈষয়িক দিকটাও তো একটু চিন্তা করতে হয়। এবার মাইনের সঙ্গে রথীন একটা চিরকুট পাঠিয়েছে, অতি অবশ্য যেন এ মাসে একটা কারেন্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠানো হয়। আজকালের মধ্যে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে, দরকার হলে তাকে কল দিতে হবে একটা। শুধু সার্টিফিকেট নয়, ফিজিওথেরাপিও দুবেলা থেকে কমিয়ে এক বেলা করা যায় কিনা, তাই নিয়েও আলোচনা করতে হবে।

সাড়ে চারটে বাজে। অফিসের সর্বত্রই একটা চেয়ার ছাড়ি চেয়ার ছাড়ি ভাব। মালবিকা অতনুদের সঙ্গে গুলতানি মারছে, মুখটুখ ধুয়ে এসে ম্যাগাজিন পড়ছে শিখা, শেষ দফার চায়ের কাপ তুলে নিয়ে যাচ্ছে সন্তোষ, তুড়ি মেরে দীপঙ্কর হাই তুলল একখানা।

দেবনাথের টেবিলে কথা বলছিল কমলেশ, কী মনে করে অর্পিতার সামনে এল। স্মিত মুখে বলল, –কী ম্যাডাম, হোমফ্রন্টের কী খবর?

অর্পিতার স্বামী অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে, এখন অর্পিতার কাছেই আছে, এ সংবাদ অফিসে গোপন নেই। অর্পিতা যেচে বলেনি, তবে ছুটি নেওয়ার জন্য যেটুকু জানানোর সেটুকু তো জানিয়েছিল। শুভেন্দু সম্পর্কে অফিসের অনেকেরই চোরা কৌতূহল, অর্পিতা বেশ টের পায়। কমলেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

আলগাভাবে অর্পিতা বলল, খবর আর কী! চলছে।

–মিস্টার কেমন আছেন?

–বেটার।

–হাঁটাচলা করছেন?

–ওই এক রকম। এখনও টাইম লাগবে।

–যাক ক্রাইসিস কেটেছে, এটাই যা বাঁচোয়া। কমলেশ চেয়ার টেনে বসল। হাসিটাকে বিস্তৃত করে বলল, –আমি সত্যিই আপনাকে অ্যাডমায়ার করি।

–অ্যাডমায়ার? আমাকে? কেন?

–আপনি আপনার হাজব্যান্ডের জন্য লড়াইটা করলেন, সমস্ত পাস্ট ভুলে গিয়ে...। আমি তো সবসময় আমার গিন্নিকে আপনার কথা বলি। আপনার মহানুভবতার কোনও তুলনা নেই।

-হুঁ, তা তো বটেই। শিখা কান খাড়া করে শুনছিল, পুট করে বলে উঠেছে,

–এমন বউ পেলে পুরুষমানুষেরই তো সুবিধে, কী বলেন?

–আহা, মানুষই তো ভুল করে। তা বলে তাকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হবে না?

-হুঁহ্, দায় পড়ে রায়মশাই! শিখা মুখ বেঁকাল। চোখ পাকিয়ে অর্পিতাকে বলল,

–ভুলে যাস না, পুরুষমানুষ হুলো কুকুরের জাত। লাই দিলে মাথায় ওঠে।... একবার যখন পায়ে এসে পড়েছে, লাগামটা কষে ধরে রাখবি। ছাড়বি না একদম।

পুরুষজাতির সঙ্গে কুকুরের উপমাটা হজম করতে বুঝি কষ্ট হল কমলেশের। তবু ঠোঁটে হাসি ধরে রেখেই বলল, শিখা দিদিমনি কিন্তু খুব ভুল বলেননি। লোহা গরম থাকতে থাকতে একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলুন। হাজব্যান্ডকে দিয়ে একটা প্রেয়ার ঠুকিয়ে দিন ওদের আসানসোল অফিসে। যদি এই মওকায় ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন।

অযাচিত পরামর্শ পছন্দ হচ্ছিল না অর্পিতার। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিটাও নয়।

তবে তার মনেও এমন একটা চিন্তা ঘুরছে বটে। অবশ্য নিজে সে শুভেন্দুকে কিছু বলবে না। যদি শুভেন্দুই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে, তখন নয় আলোচনা করা যাবে রথীনের সঙ্গে।

শুকনো হেসে অর্পিতা বলল, বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথা বলুন। পূজোর আগে কি এরিয়ারের টাকা পাচ্ছি?

–রেডি–রেকনার তো সবে হাতে এল। তবে বিলটিল শুরু করে দিলে না পাওয়ার তো কোনও কারণ দেখি না। কমলেশ গলা নামাল, আপনার সেই জমি কেনার কদ্দূর?

–দাঁড়ান। টাকাপয়সা হাতে আসুক। তাছাড়া একটু দোটানাতেও পড়ে গেছি।

–কী রকম?

–প্রচুর খরচাপাতি হয়ে গেল তো। সামনে আরও আছে...

–জমিটা আপনি বায়না করে ফেলেছিলেন না?

–কই আর হল!... ভাবছি, আপাতত ও ভাবনাটা ছেড়েই দেব।

–যদি না নেন, আমাকে অন্তত একবার বলবেন। আমার মেজো ভায়রা ওদিকেই একটা জমি খুঁজছিল।

–ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই বলব।

কমলেশ উঠে পড়ল। এই কথাটাই কি বলতে এসেছিল কমলেশ? তার আগে রীতিমাফিক কৌতূহলটা দেখিয়ে নিল? অর্পিতা ঠিক বুঝতে পারল না। পরশুও দিদি জিজ্ঞেস করছিল, অর্পিতা জমিটা নেবে কিনা...। ভাবার আছে। সত্যিই এখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার আছে। বাড়ি ফেরার পথেও মনে মনে হিসেব কষছিল অর্পিতা। এরিয়ার মোটামুটি হাজার পঞ্চান্ন মতন হচ্ছে, তার থেকে পি-এফে কিছু চলে যাবে... হাতে হয়তো পঞ্চাশের

কাছাকাছি

... বাকি পঞ্চাশ জোগাড় হবে কোত্থেকে? শুভেন্দুর মাইনেটা হাতে আসছে ঠিকই, তবে খরচও তো কম হচ্ছে না। ফিজিওথেরাপির পিছনে দিনে একশো একশো দুইশো। মাস দেড়েক ধরে অবশ্য একটু কম নিচ্ছে, তাও তো মাসে সাড়ে চার হাজার। এর সঙ্গে আয়া ধরলে ছ'হাজার। তাছাড়াও ওষুধ ইঞ্জেকশান...। শুভেন্দু এখন তো লাঠি ধরে ধরে বাথরুম অবধি যেতে পারে, এখন আয়াটাকে ছাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? শুভেন্দুও মনে হয় খরচ খরচা নিয়ে চিন্তা করছে। পরশু নিজেই বলছিল আয়াকে অফ করে দেওয়ার কথা। ভূতের মুখে রামনাম! ভাবা যায়?

বাস থেকে নেমে টুকটাক বাজার সারল অর্পিতা। কাচাকুচি বেশি হচ্ছে, গুঁড়ো সাবান শেষ, ছোট এক প্যাকেট সাবান কিনল। সঙ্গে বিস্কুট, এক শিশি হরলিক্স। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছ থেকে শুভেন্দুর জন্য ফলও কিনল কিছু। বেদানা আপেল মুসম্বি কলা। একসময়ে আপেল ছুঁত না শুভেন্দু, এখন সেদ্ধ করা আপেল সোনামুখ করে খায়। বাড়ি ঢোকার আগে মিষ্টির দোকান থেকে সিঙাড়া কিনল খানকতক। লাল্টু বুবলি খাবে। নিজেও।

সদর দরজা খোলা। গলিতে আলো এসে পড়েছে। বুবলি ছাড়াও আর এক নারীকণ্ঠ কানে এল অর্পিতার। ভেতরে ঢুকে দেখল শুভেন্দুর বোন আবির্ভূতা। বেতের চেয়ারে বসে কলকল করছে সুমিতা। বুবলির সঙ্গে শুভেন্দুও সেখানে উপস্থিত।

অর্পিতা ননদকে জিজ্ঞেস করল, কখন এলে?

–অনেকক্ষণ। সেই তিনটের সময়। তোমার জন্য বসে বসে চলেই যাচ্ছিলাম, ছোড়দা জোর করে আটকে রাখল।

–ভালই করেছে। তোমার দর্শন মিলল।

–আহা, আমি বুঝি আসি না? গত রোববারের আগের রোববারই তো এলাম, তোমার নন্দাইকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্লেষটা বিঁধেছে বলে অর্পিতা খুশিই হল। সুমিতাকে তার মোটেই পছন্দ নয়। বয়স তো মেঘে মেঘে কম হল না, অর্পিতার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট, হাবভাব করে যেন কচি খুকি। বর চাকরি করে মোটর ভেহিকলসে, দুহাত্তা ঘুষ নেয়, বরের চুরির টাকায় বউ-এরও দেমাক খুব।

ভদ্রতা করে অর্পিতা বলল, চা-টা খেয়েছ?

–শুধু চা কী গো! বুবলি আমাদের এক্সপার্ট হয়ে উঠেছে, রীতিমত লুচি ভেজে খাওয়াল।

–মোটেই আমি একা করিনি। আয়ামাসি আমায় হেল্প করেছে। শুভেন্দু বলল, বুবলি, এবার তোমার মাকেও চটপট চা করে দাও।... সুমি, তুইও খা আর এক কাপ।

ফল সিঙাড়ার ঠোঙ্গা বুবলির হাতে ধরিয়ে দিল অর্পিতা। আয়া মহিলাটির এখন কোনও কাজ নেই, সে সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে সিঙাড়া ঢেলে এনেছে। লাল্টু অর্পিতার ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিল একখানা সিঙাড়া। কামড় মেরেই গরমে উহুহু করছে দেখে সুমিতার কী হাসি। শুভেন্দুও হাসছে মুখ টিপে।

ফস করে সুমিতা বলল, লাল্টুটা একদম ছোড়দার নেচার পেয়েছে। কচুরি সিঙাড়া দেখলেই হামলে পড়ে।

ছোড়দার নেচার! কথাটা ঠং করে বাজল অর্পিতার কানে। মুখে কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল ব্যাগ রাখতে। বাথরুম ঘুরে এসে বসল আবার।

নিরুত্তাপ স্বরে প্রশ্ন করল, তোমার ছেলের কী খবর?

–খুব আদাজল খেয়ে লেগেছে। কিছুতেই জেনারেল লাইনে পড়বে না, এখন থেকেই জয়েন্টের প্রিপারেশান নিচ্ছে। ওর বাবারও খুব ইচ্ছে রানা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনেই যাক।

শুভেন্দু বলল, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাওয়া কিন্তু কঠিন।

–এখানে না পেলে বাঙ্গালোরে চেষ্টা করব।

–সে তো অনেক টাকার ধাক্কা রে।

–ছেলের ফিউচারের জন্য খরচ তো একটু করতেই হবে ছোড়দা। বলেই লাল্টুর দিকে ফিরেছে সুমিতা, অবশ্য আমাদের লাল্টুর খুব মাথা। কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে, নিশ্চয়ই এমএসসি করবে... ও ঠিক ওর মত করে শাইন করে যাবে, দেখো। বড়দা তো সবসময় বলে লাল্টু আমাদের বংশের সব চেয়ে ব্রাইট ছেলে।

ফের সেই ঢঙের কথাবার্তা। হাড় কালি করে ছেলে মানুষ করছে অর্পিতা, গর্বে চাঁদি ফাটে বংশের!

আরও খানিকক্ষণ বকবক করে সুমিতা উঠল। দাদার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাও ছোড়দা। তারপর একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। দেখবে কী সুন্দর গোলাপ বাগান করেছি।

–আমার এখন বাইরে বেরোতে ঢের দেরি। শুভেন্দু হালকা শ্বাস ফেলল, তোরাই বরং আয় মাঝে মাঝে।

–নিদেনপক্ষে খবরটুকু নিয়ো। অর্পিতা ফের হুল ফোটাল, তাতেও তোমার ছোড়দার ভাল লাগবে।

-তোমরা একটা ফোন নিলেই তো ঝামেলা থাকে না বউদি। তাহলে তো রোজই খবর নিতে পারি।

–আমার এখন অত ক্ষমতা নেই ভাই।

–বোকো না। আজকাল টেলিফোন নিতে কী এমন পয়সা লাগে? এখন তো ঘরে ঘরে সকলের ফোন। তোমার নন্দাই-এর পিওনের পর্যন্ত ফোন আছে।

–যেক'টা পয়সাই খরচ হোক, সেটা তো রোজগার করতে হয় সুমিতা। কথাটা বেশি কড়া হয়ে গেল ভেবে অর্পিতা ঠাট্টার সুরে বলল, নিজে তো রোজগার করো না, টাকার মর্ম তুমি কী বুঝবে?

সুমিতা থতমত খেয়ে গেল। কেঠো হেসে বলল, ঠিক আছে বাবা, এনো না টেলিফোন। দাদা যখন আমার, আমিই নয় ছুটে আসব। বলেই ফের ঘুরে শুভেন্দুকে বলল, ফলগুলো খেয়ো ছোড়দা। লেক মার্কেট থেকে তোমার জন্য সেরা আঙুর এনেছে তোমার ভগ্নিপতি! গোটা কলকাতা জুড়ে এমন আঙুর তুমি পাবে না।

অর্পিতার মনে হল সুমিতার এই কথাতেই প্রচ্ছন্ন অহমিকা আছে। হঠাৎ দাদার ওপর এই দরদ উথলে পড়াটা কি বাড়াবাড়ি নয়?

সুমিতা চলে যাওয়ার পর লাল্টু বলল, তোমার আজ কী হয়েছে মা? পিসির সঙ্গে অমন চ্যাটাং চ্যাটাং করে কথা বলছিলে কেন?

অর্পিতা স্পষ্ট জবাব দিল, কারণ তোমার পিসির এই আলগা পিরিত আমার ভাল লাগে না।

বুবলি বলে উঠল, কিন্তু পিসি তো খারাপ কথা কিছু বলেনি। তুমিই তো বলো বাড়িতে একটা ফোন থাকলে কত সুবিধে...

–সে যখন বলেছি তখন বলেছি। অর্পিতা জেদ ধরেই আছে, এখন আমার কী হাল তোর পিসি জানে না? দূর থেকে জ্ঞান ঝারতে সবাই পারে।

–আহা, ক'টাই বা টাকার ব্যাপার। শুভেন্দু দুম করে নাক গলিয়ে ফেলেছে,

–এবার সত্যিই একটা টেলিফোন দরকার।

–ক'টা টাকাই বা দেবে কে?

–আমি দিতে পারি।

– তুমি?

– কেন নয়?

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

–তারপর মাস মাস বিল?

–বলছি তো, আমি আছি।

লাল্টু হাত উল্টোল, ব্যাস, তাহলে তো আর প্রবলেম নেই মা?

একেবারে নির্দোষ সংলাপ। অর্পিতা তবু দপ করে জ্বলে উঠল, থাম্। ওসব বড় বড় বুকনি অনেক শুনেছি। কে কী করেছে সারাজীবন, সব দেখা আছে।

শুভেন্দুর মুখ পলকে কালো। বসে আছে ঘাড় ঝুলিয়ে।

বুবলি খরখরে চোখে মাকে দেখল একবার। পরক্ষণে গিয়ে শুভেন্দুর কাঁধে হাত রেখেছে, ওঠো বাবা। চলো। অনেকক্ষণ ঠায় বসে আছ, এবার শুয়ে পড়ো। পাংশু মুখে ঘরে যাচ্ছে শুভেন্দু। হাতের বেড়ে বাবাকে আগলে আছে বুবলি। আয়া মহিলাটি ধরতে আসছিল, মাথা নেড়ে বুবলি তাকে বারণ করে দিল।

মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে শুভেন্দুর চলে যাওয়াটা ক্ষণকাল দেখল অর্পিতা। কী একটা যেন কুনকুন করছে বুকে। কী যে?

লাল্টু আচমকা চাপা গলায় বলে উঠেছে, কথাটা ওভাবে বলা কি ঠিক হল মা? তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি... ইটস নট ফেয়ার মা।

অর্পিতা চুপ মেরে গেল। নিজেকেই নিজে পড়তে পারছে না যেন। লাল্টু বুবলি শুভেন্দুকে মেনে নিক, এটাই তো সে চেয়েছিল। কিন্তু বাবার জন্য তাদের এই অনুভূতি যেন কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না।

আশ্চর্য, মন যে কখন কী চায়!

মানুষের মনে যে কত অসংখ্য কুঠুরি। কোনও কুঠুরিতে বাস করে প্রেম, কোনওটায় ঘৃণা, কোথাও দয়া, কোথাও মায়া, আবার কোথাও নিষ্ঠুরতার অধিষ্ঠান। স্নেহমমতার জন্যও আছে আলাদা কুঠুরি, ঈর্ষারও আছে আলাদা কক্ষ। জেদের নিজস্ব কুঠুরি আছে। দম্ভেরও। হীনম্মন্যতারও।

প্রতিটি কুঠুরিতে আবার অজস্র ভাগ। ছোট ছোট খোপ। যেমন ধরা যাক, ভালবাসার কুঠুরি। এখানে কোনও খোপে থাকে ভীরু প্রেম, কোনও খোপে বাস করে উদ্দাম ভালবাসা, আবার কোথাও বা গোধূলিবেলার মরে আসা আলোর মতো ভালবাসা টিমটিম করছে। ঈর্ষার কুঠুরিতেও কি কম খোপ? টাকার জন্য ঈর্ষা, যশের জন্য ঈর্ষা, অধিকার পেয়ে ঈর্ষা, অধিকার হারিয়ে ঈর্ষা। ভালবাসা পাওয়ার জন্য ঈর্ষার খোপ যত বড়, ভালবাসা দেওয়ার জন্য ঈর্ষার খোপ তার চেয়ে মোটেই ছোট নয়।

লাখো লাখো অনুভূতি এভাবেই সহবাস করে। পাশাপাশি। সব কুঠুরির অনুভূতির একসঙ্গে দেখা পাওয়ার জো নেই। এক আধটা কুঠুরির দু'চারটে খোপ মোটামুটি চালু থাকলেই হল, তাতেই মানুষের দিব্যি চলে যায়।

কুঠুরি আলাদা, খোপ আলাদা, তবু যেন অনুভূতিগুলো পরস্পরের ছোঁয়া ছাড়া বাঁচতে পারে না। মাঝে যে তাদের কোনও আগল নেই, যা আছে তা নেহাতই কিছু সূক্ষ্ম ছিদ্রময় ঝিল্লি। এক খোপের অনুভূতি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়তে পারে অন্য খোপে। কিংবা অন্য কুঠুরিতে। তেমন হলে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া সেই মিশ্র অনুভূতিকে তখন চেনা দায়।

অর্পিতার মনেরও এখন সেই মিশ্র দশা। সে ঠিক ঠিক চিনতে পারছে না নিজেরই মনকে। একযুগ আগে শুভেন্দু যখন চলে গিয়েছিল, অর্পিতার মনে যে অনুভূতি ছিল তা শুধুই অবিমিশ্র ঘৃণা আর অপমানবোধ। বাকি কুঠুরি তখন একদম অকেজো হয়ে পড়েছিল। তারও আগে, বছর দু'তিন তাবিজ কবচ মাদুলি করে শুভেন্দুকে শোধরাতে চেয়েছে অর্পিতা, তখন যেন এক হেরে যাওয়ার গ্লানি মন ছেয়ে থাকত অনুক্ষণ। একটা হীনম্মন্যতা বোধও ছিল যেন। শুভেন্দু রীতিমত রূপবান পুরুষ, তুলনায় অর্পিতা নিতান্তই সাদামাটা, তাই বুঝি সে ধরে রাখতে পারেনি শুভেন্দুকে। কিন্তু ঠিক সেরকমটাও তো নয়। শুভেন্দু তো ছিল বিকৃতকাম। শুভেন্দুর দাদা

বোনরা বলত ওটাই না শুভেন্দুর অসুখ। পুরোপুরি হাল ছাড়ার আগে অর্পিতাও হয়তো বিশ্বাস করত কথাটা। ওই বিশ্বাসটুকুই ছিল তখন তার সান্ত্বনা। তখনও কি অর্পিতা ভালবাসত শুভেন্দুকে? না, ওই কুঠুরি তখন অসাড়। তবু কিছু একটা তো ছিলই। নইলে বারো বছর যে লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, যাকে ছাড়াই বেঁচে থাকাটা অভ্যাস করে ফেলেছে অর্পিতা, আচমকা তার অসুখের খবর পেয়ে সে ছুটে যাবেই বা কেন? শুকনো কর্তব্যবোধ? নাকি লম্পট লোকটাকে ফিরিয়ে এনে সে পাঁচজনের বাহবা কুড়োতে চাইছিল? দ্যাখো সবাই আমি কত মহৎ!

বোধহয় কিছুটা তাই-ই। কিছুটা কেন, অনেকটাই তাই। ছেলেমেয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে মহানুভব সাজতে চাইছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ভ্রূকুটি হানবে জেনেও সে চেয়েছিল নিজের উচ্চতা বাড়াতে। শুভেন্দুকে দয়া দেখাতে চেয়েছিল।

তবু যেন কখন করুণা আর কর্তব্যবোধের মাঝে প্রেম এসে গেল। তা না হলে শুভেন্দু যখন তার হাত আঁকড়ে ধরে, চোখে গাঢ় ভাষা ফোটায়, কেন অর্পিতার বুক মুচড়ে মুচড়ে ওঠে? যখন শুভেন্দু বাকশক্তিরহিত, পাশটাও ফিরতে পারছে না, মাঝরাতে তখন হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙ্গে যেত অপির্তার। মৃদু রাত বাতি জ্বলছে ঘরে, আবছা সবুজ আলোয় অর্পিতা দেখত শুভেন্দুকে। মানুষটা বেঁচে আছে তো? নিঃশ্বাস পড়ছে তো?

এক রাতে ঘুমন্ত শুভেন্দুর গলা দিয়ে একটা বিকট আওয়াজ বেরুচ্ছিল। অর্পিতার বাথরুমের জলবিহীন খোলা কলে যেমন আওয়াজ হয়, ঠিক তেমনি। ধড়মড় ছুটে গিয়েছিল অর্পিতা। ঠেলেছিল শুভেন্দুকে। লোকটা চোখ খোলার পরও হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস।

এ কি শুধুই করুণা? শুধুই কর্তব্য করে মহান সাজার প্রয়াস? শুভেন্দু মরে গেলেই বা কি এসে যেত অর্পিতার? সে যে ধরনের সধবা আছে, আর যে ধরনের বিধবা হবে, তার মধ্যেই বা কতটুকু প্রভেদ?

কিন্তু সেই ভালবাসার অনুভূতিও নিখাদ থাকতে পারল কই! ঘৃণা, রাগ, বিরক্তি– কিছুই পুরোপুরি মোছে না যে। ঈর্ষার কুঠুরিও সজাগ হচ্ছে ক্রমশ, বিন্দু বিন্দু করে মিশে যাচ্ছে ভালবাসায়। শুধু কি ঈর্ষার কুঠুরি? নাকি অধিকার বোধেরও? যে ছেলেমেয়েকে সে একা একাই বড় করেছে, যারা পৃথিবীতে মা ছাড়া কাউকে জানত না, তাদের হঠাৎ বাবার ওপর এত কিসের টান? লাল্টু বুবলি শুভেন্দুকে নিছক দয়ার চোখে দেখলে, শুধু নিষ্প্রাণ সেবা করে গেলে, অর্পিতার হয়তো এই খোঁচাটা লাগত না, কিন্তু শুভেন্দুর দিকে ক্রমে পাল্লা ভারী হয়ে যায় যে! কেন এমন হবে?

অর্পিতার খুব কষ্ট হয়। ভীষণ খারাপ লাগে।

টেলিফোন সংক্রান্ত বচসার পর সেদিন রাতে শুভেন্দুর সঙ্গে কথা হয়েছিল অর্পিতার। রাতে শুভেন্দুকে ওষুধ খাইয়ে মশারি টাঙাচ্ছে। শুভেন্দুই হঠাৎ বলল– আমার ওপর তোমার আর এক কণা বিশ্বাসও নেই, তাই না?

অর্পিতার ভেতরে তখন আঁচটা ছিল। ভার গলায় বলেছিল, বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি?

–তা অবশ্য ঠিক। তবে আমি এবার সত্যি বদলে গেছি অপু। চেষ্টা করলেও আর আগের জীবনে ফিরতে পারব না। তুমিই দেবে না ফিরতে।

–মানে?

আমি শয়তান হতে পারি। তবে শয়তানের মধ্যেও তো কখনও কখনও কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে।

–কৃতজ্ঞতা কে চায়?

–তার বেশি আমি আর কি দিতে পারি বলো? আর কি দেওয়ার অধিকার আছে আমার?

আশ্চর্য, কথাটাকে তখন মোটেই ভণিতা মনে হল না অর্পিতার। বরং কাঁটা দিচ্ছিল গায়ে।

শুভেন্দু আবার বলেছিল– লাল্টুর কিন্তু তোমাকে ও কথাটা বলা উচিত হয়নি। অর্পিতা চমকে তাকিয়েছিল।

শুভেন্দু মাথা নেড়ে বলল– আমি সব শুনেছি। লাল্টু কোন্ সাহসে বলে ইটস নট ফেয়ার। আমি তো জানি

কত দুঃখে তুমি...।

–তার হয়তো বাবার দুঃখ বেশি লেগেছে।

–কেন লাগবে? ছেলেমেয়ে কি জানে না তুমি তাদের জন্য কত কি স্যাক্রিফাইস করেছ?... না না, এ ভাল কথা নয়। লাল্টুকে একটু বকা দরকার।

এমন কথায় অর্পিতার তো মন ভিজে যাওয়া উচিত। কিন্তু কেন যে হু হু করে বেড়ে গেল যন্ত্রণাটা? দু'দিন এসেই ছেলেমেয়েকে বকাবকি করার অধিকারও পেয়ে গেল শুভেন্দু? এতকাল ধরে সে যে অন্যায়টা করেছে, সব ধুয়ে-মুছে সাফ? উল্টে সে এখন ছেলেমেয়ের কাছে অর্পিতার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দায়িত্ব নেবে?

তবে সেদিন আর বাদানুবাদে যায়নি অর্পিতা। একটা অসুখের ধাক্কায় শুভেন্দু যদি নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে, তার চেয়ে ভাল আর কি আছে! অধিকারবোধ নিয়ে তুচ্ছ মান-অভিমান তো জিইয়ে না রাখাই ভাল।

কিন্তু অভিমানের কুঠুরিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা কি এতই সহজ? কিংবা ঈর্ষার গোপন কক্ষটাকে?

দিন কয়েক পরের কথা। বিশ্বকর্মা পুজোর আগের রবিবার দুপুর বেলা খেয়ে উঠে বুবলিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্পিতা। পুজোর শপিং সারবে। এরিয়ার এখনও হাতে না এলেও পুজোর অ্যাডভান্স মিলে গেছে, তাই নিয়ে হয়ে যাবে বাজারটা।

কাছাকাছি গড়িয়াহাট মার্কেটই অর্পিতার পছন্দ। সার সার দোকান, অজস্র হকার, যা চাও সবই মজুত। প্রথমেই বুবলি আর দিদির মেয়ের জন্য সালোয়ার-কামিজ কিনল, পছন্দ হয়ে গেল বুবলির জন্য একটা লংস্কার্টও। লাল্টুর কেনাকাটা লাল্টু নিজেই করে, অর্পিতা টাকা দিয়েই খালাস। তবু তার জন্য দু'খানা টি-শার্ট কিনল অর্পিতা। তারপর কাজের লোকের কাপড়-চোপড়, দিদির শাড়ি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়িয়েছে পাঞ্জাবির দোকানের সামনে।

বুবলিকে বলল– তোর বাবার কত সাইজ হতে পারে রে?

বুবলি ঠোঁট উল্টোলো, কী জানি!... ওই কাউন্টারের লোকটার মতনই তো হাইট হবে। ওকে জিজ্ঞেস করো না ওর কত মাপ।

–সাদাই নিই, কি বলিস?

–এহ্, সাদা কেন? সাদায় বড্ড বুড়ো বুড়ো লাগে।

–বুড়োই তো, বায়ান্ন-তিপ্পান্ন বছরের লোক!

–মোটেই না। ওটা কোন বয়সই নয়। বাবার স্বাস্থ্যও এখন অনেকটা ফিরেছে...ওই মেরুনটা নাও না মা।

–কত চড়া রং?

–অবশ্যই। বাবা কত ফর্সা। সেদিন বাবা খুঁজে খুঁজে পুরনো অ্যালবামটা বার করেছিল... সেখানে একটা নেভিব্লু পাঞ্জাবিতে কি হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছিল বাবাকে।

অর্পিতার মনে পড়ল শুভেন্দুর একটা ওই রঙের পাঞ্জাবি ছিল বটে। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, শুভেন্দু এখন অর্পিতার সংসার ঘাঁটাঘাঁটি করছে। পুরনো অ্যালবাম বার করে ছবি দেখাদেখি করছে বাপ-মেয়ে!

বুবলি আদুরে গলায় বলল– কেন না মা ওটা।

অজান্তেই ইচ্ছে-অনিচ্ছের দোলাচল। তবু কাউন্টারে গেল অর্পিতা। কিনছে। মেরুনটাই। লাল্টুর জন্য পাঞ্জাবি নিল একটা। অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের। ইচ্ছে করেই। পাজামাও কিনল এক জোড়া করে। বাবারও। ছেলেরও।

দোকানে বেজায় ভিড়। কাউন্টারের লোকটা সময় নিচ্ছে, হঠাৎই অর্পিতা দেখল মেয়ে ফুড়ুৎ। এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল, দোকানের বাইরেটায় দাঁড়িয়ে একটা লম্বা মতন ছেলের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছে বুবলি।

প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই বুবলি ফিরেছে। অর্পিতা জিজ্ঞেস করল, কে রে ছেলেটা?

–ও তো শুভদীপ।

–তোদের ক্লাসে পড়ে?

–না। লাস্ট ইয়ার মাধ্যমিক দিয়েছিল।

–তাই বল। আমি ভাবলাম তোদের ক্লাসের...। আগে তো কখনও একে দেখেনি?

–কি করে দেখবে? বাড়িতে তো আসেনি কখনও। বুবলি যেন একটু গদগদ।

–জানো তো মা, শুভদীপ দারুণ ক্রিকেট খেলে। আমাদের স্কুলের ক্রিকেট ক্যাপটেন ছিল।

–হুঁ? অর্পিতা ঈষৎ তরল মেজাজে বলল– এ কি তোর স্পেশাল বন্ধু?

–দূর, কি যে বলো না! বুবলি ফিক করে হাসল, 'যেমন তুমি, তেমনি বাবা।'

–কেন, তোর বাবা কি করল?

– তোমাই মতন কৌতূহল। ...হ্যাঁ রে বুবলি, তোর ক'টা বয়ফ্রেন্ড?...আমি তো লিস্ট ধরে ধরে নাম বলে যাচ্ছি...ওমনি বাবার প্রশ্ন, ওরকম নয়, স্পেশাল কেউ আছে কিনা বল। আমি যত বলি, আমার চোখে সব বন্ধুই সমান, বাবা মানতেই চায় না। হি হি হি হি।

অর্থাৎ বাপ মেয়েতে এসব আলোচনাও চলছে আজকাল। অর্পিতা গম্ভীর হয়ে গেল। ছেলেমেয়ের সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠতা নেই তা নয়, কিন্তু শুভেন্দু বুবলির মাখামাখিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কী?

আকাশ আজ অসম্ভব ঝকঝকে। কেউ যেন যত্ন করে ধুয়ে দিয়েছে, এখানে ওখানে এখনও লেগে আছে সাবানের ফেনা। ভাদ্রের গুমোট কাটছে, হাওয়া বইছে এলোমেলো। পাঁচটা বাজে প্রায়, সূর্যের তেজ আর নেই, পাকা ধানরঙা রোদ্দুরের নরম আলোয় মেদুর হয়ে আছে বিকেলটা। পুজো মার্কেটিং-এর ভিড়ও আজ হয়েছে খুব, দু'পা হাঁটতে চারবার ঠোক্কর খেতে হয়।

আলো আর ঠোক্কর সঙ্গে নিয়েই হাঁটছিল অর্পিতা। ঠোক্করটা বেশি, আলো কমে যাচ্ছে ক্রমশ। সুড়ুৎ সুড়ুৎ ফাঁক গলে এগিয়ে যাচ্ছে বুবলি, অর্পিতা বারবার পিছিয়ে পড়ছিল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বুবলি দাঁড়িয়ে পড়ল– কিছু খাওয়ালে না মা?

হাঁটাহাঁটি করে অর্পিতারও কোমর টনটন, দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে একটু, বলল– কি খাবি?

–খাওয়াও যা খুশি। রোল-টোল, ফুচকা-টুচকা।

মোড়ের ফুটপাতের দোকানটা বেশ রোল বানায়। মা-মেয়ে দুটো চিকেন রোল নিল। ভিড় থেকে খানিক সরে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে।

অর্পিতার বুকের কুট সংশয়ের খোপটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল। করব না করব না করেও মেয়েকে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে– বাবার সঙ্গে আজকাল কি কি গল্প হয় রে বুবলি?

–কত কি। স্কুলের গল্প, খেলার গল্প, টিউটোরিয়ালের গল্প...। এক টুকরো কাবাব পড়ে যাচ্ছিল মুখ থেকে, খপ করে সেটা মুখে পুরে নিল বুবলি– তোমার কথাও হয়।

–আমার কথা?

–হ্যাঁ, তোমার কথা বাবা খুব বলে।... জানো মা, বাবা এখন খুব রিপেন্টেন্ট। বুবলির চোখ সহসা দুঃখী দুঃখী– সেদিন তোমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে চোখ মুছছিল। বলছিল, তোর মা'র জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম...।

অর্পিতা মোটেই পুলকিত হল না। উফ, শুভেন্দুটা কি মেপে মেপে চাল দিচ্ছে! ছেলেমেয়েকে জয় করার কি নির্লজ্জ প্রয়াস! লাল্টু, বুবলিই বা কি? পুরনো কথা ভুলে গেল?

লাল্টু তো আজকাল রীতিমত নাচছে বাবার কথায়। একদিন সকালে কি কারণে যেন হঠাৎ রানার প্রসঙ্গ এসে পড়ল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বুবলি বলল– কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে রানাদার কিন্তু দারুণ কেরিয়ার।

লাল্টু বলল, ও তো ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতেই চাকরি পেয়ে যাবে।

শুভেন্দু বলে উঠল, তোরও কেরিয়ার কিছু খারাপ হবে না রে লাল্টু। বিএসসি, এমএসসি, তারপর পিএইচডি... বিদেশ যাওয়া তোর আটকায় কে! তুই এক কাজ কর, সঙ্গে একটা ভাল কম্পিউটার কোর্সও করে নে।

–কম্পিউটারের ভাল কোর্স করতে গেলে অনেক টাকা লাগে বাবা। কোত্থেকে পাব?

–সে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ছেলের চোখে চোখ রেখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল শুভেন্দু– খরচপত্রের কথা তোকে ভাবতে হবে না।

লাল্টু কি বুঝল কে জানে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখ জ্বলজ্বল, যেন বাবাই এখন তার একমাত্র ভরসা। লাল্টুর পিছনে অর্পিতার যে এত টিউটর লাগল, সাধ্যের অতিরিক্ত করে দামি স্কুলে পড়ালো, সবই যেন এখন শূন্যগর্ভ।

নন্দিতা, অমলকেও দিব্যি হাত করে ফেলেছে শুভেন্দু। এমন কি টুকু, যে প্রথমে শুভেন্দুকে দেখলে সরে যেত, সে পর্যন্ত মেসো বলতে অজ্ঞান। শুভেন্দু ভাল হয়ে গিয়ে অর্পিতার আজীবনের সংগ্রামটা নস্যাৎ করে দিল।

নন্দিতা তো আজকাল বলতে শুরু করেছে, শুভেন্দুর এমন চেঞ্জ এসে যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি। স্ট্রোক হয়ে সাপে বর হল, আর তোকে একা সংসারের ঘানি টানতে হবে না।

অর্পিতা একদিন ফস করে বলেছিল, আর বাকি কিই বা আছে রে দিদি?

–নেই? এখনও কত কাজ বাকি। ছেলে এখনও দাঁড়ায়নি, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এখনই বরং শুভেন্দুকে তোর বেশি প্রয়োজন।

–হুম। তবে তোদের দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকি বানাতে গিয়ে আমার প্রচুর গচ্চা যাচ্ছে।

–কেন? এখন আর কি এমন খরচা? উল্টো শুভেন্দুর মাইনেটাও হাতে পাচ্ছিস। হ্যাঁ, নন্দিতার মুখ থেকেও শুনতে হচ্ছে এসব। যে নন্দিতা শুভেন্দুর নাম শুনলে থুতু ফেলত, সেই নন্দিতা, যে কিনা অর্পিতার আদ্যোপান্ত ইতিহাস জানে।

পুরুষ মানুষ নরকে নেমে যাক, আর চুলোয় যাক, একবার অনুশোচনা দেখালেই সাত খুন মাফ! কি আশ্চর্য!

এই রূঢ় সত্যিটা কি নন্দিতাকে পীড়া দেবে না একটুও? অভিমানে ছেয়ে যাবে না বুক? ঈর্ষা-সংশয়, অধিকারবোধ তালগোল পাকিয়ে গুলিয়ে দেবে না ভালবাসাকে? সব মিলিয়ে অর্পিতার অনুভূতিটা এখন যে ঠিক কি রকম?

এ কি বিষণ্ণতা? না অসহায়তা?

অর্পিতাদের অফিসে আজ আনন্দের জোয়ার। হিসাবপত্রের দিন শেষ, এরিয়ারের চেক বিলি হল আজ।

অর্পিতাও খুশি। তবে অন্যদের মত হো হো উল্লাসে ফেটে পড়ছে না। এমনিতেই তার উচ্ছ্বাস চিরকালই কম, তার ওপর ইদানীং অফিসে সে একটু সিঁটিয়েই থাকে। চরিত্রহীন স্বামীকে ত্যাগ করে একার জোরে বেঁচে আছে এমন মেয়েদের জন্য মানুষের মনে একটা শ্রদ্ধার আসন থাকে। এখন সেটা দু'ভাবে টাল খেয়েছে। একদল

যেন বলে, খুব তো এতদিন স্বামীর নাম শুনলে নাক সিঁটকোতিস, এখন সেই পতিসেবা করেই তো ধন্য হলি! অন্য দল যেন বলে, এত কঠিন মেয়ে হয়েও শেষে ওই স্বামীর চক্করে পড়ে গেলি অর্পিতা! তোকে একটু আলাদা ধাঁচের মহিলা ভাবতাম, তুইও শেষে সাধারণ পর্যায়ে নেমে গেলি! তবে অর্পিতার বিচ্যুতিতে কোন পক্ষই বুঝি অসুখী নয়। বরং অর্পিতার আর তেমন মহিমা নেই ভেবে অনেকেই যেন তৃপ্ত।

মুখে অবশ্য এসব বলে না কেউ। তবু অর্পিতার এমনটাই মনে হয়। অর্পিতা কি শেষে স্নায়ুরোগের শিকার হয়ে পড়েছে?

অফিসে আজ কাজ বিশেষ নেই। মাইনে বাড়ার সংবাদে কাজকর্ম শিকেয় উঠেছিল, টাকা পেয়ে আজ পোয়া বারো। আবু হোসেনের ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। তার মধ্যেই অর্পিতা ফাইল খুলল একটা। এজেন্সির রিনিউয়ালের কাগজপত্র। দেখার কিছু নেই, রুটিন কাজ, কয়েকটা কলমে চোখ বুলিয়ে টিক মারছে।

–কি ম্যাডাম, আজও কাজে এত মনোযোগ?

স্বভাবসুলভ হাসিটি ঝুলিয়ে কমলেশ। অর্পিতা চোখ থেকে চশমা নামাল, সকাল থেকেই তো বসে আছি, তাই একটু ফাইলটা খুলে...।

–শুনেছেন তো, অফিসে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে?

–কি?

–একটা গ্রান্ড ফিস্ট হবে। সোনারপুর দীপঙ্করের একটা চেনা বাগান বাড়ি আছে... দেওয়ালির পর ডেট ফিক্সড হচ্ছে।

–ও হ্যাঁ, মালবিকা বলছিল বটে।

–যাবেন তো?

–দেখি।

–দেখি-টেখি নয়, যেতেই হবে। এটা কিন্তু ফ্যামিলি পিকনিক। মিস্টার, ছেলেমেয়ে সবাইকে আনতে হবে।

অর্পিতা আড়ষ্ট হয়ে গেল সামান্য। ফের বলল– দেখি।

কমলেশ প্রসঙ্গ ঘোরাল, জমিটা তাহলে কিনছেন?

–ভাবছি।

–এখনও ভাবছেন? পিএফ লোনের দরখাস্ত দিয়ে দিন, আমি তাড়াতাড়ি প্রসেস করে দেব। এরিয়ার, প্লাস লোন... জমির টাকা তো উঠেই গেল।

–আমি অন্য কথা ভাবছি।... আপনার ভায়রাভাই জমি পেয়ে গেছেন?

–খুঁজছে।... কেন, আপনি নেবেন না জমিটা?

–ভাবছি টাকাটা ফিক্সড করেই রাখি এখন। ছেলেকে পার্ট ওয়ানের পর যদি একটা ভাল কম্পিউটার কোর্স করাতে হয়...

কি যে বলেন ম্যাডাম! আপনাদের তো এখন জয়েন্ট ইনকাম। আপনি জমিটা কিনে ফেলুন, মিস্টার বাড়ি তুলবেন। মিস্টারের যেন কতদিন চাকরি আছে আর?

–তা আছে। সাত-আট বছর।

–তাহলে আর চিন্তা কি! মেয়ের বিয়েও হয়ে যাবে এর মধ্যে।

–হুম।

–মিস্টার কি ট্রান্সফার সিক করলেন? কলকাতায় চলে আসার?

অর্পিতার ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। ঘাড় নাড়ল আবছাভাবে। হ্যাঁ বলল, নাকি না, বোঝা গেল না।

সন্তোষ কাপ-কেটলি হাতে হন হন চলেছে। কমলেশকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল, আপনাকে মেম সাহেব খুঁজছিলেন।

–অসময়ে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারের ডাক? কমলেশ কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। যেতে যেতে বলল, যা বললাম সেটা করে দিন কিন্তু।

অর্পিতা একটুক্ষণ কপালের রগ টিপে বসে রইল। পরশুই দিদি, জামাই বাবু এসেছিল বাড়িতে। বলছিল দালালটা নাকি তাগাদা দিচ্ছে, ঝুলিয়ে না রেখে নিদেনপক্ষে এখন জমির বায়নাটা তো করে রাখুক অর্পিতা।

শুনেই শুভেন্দু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি নয়। ঝটপট বুক করে ফ্যালো। জমি কেনা হয়ে গেলে বাড়ি করার কাজ অনেকটাই তো এগিয়ে থাকে।

আশ্চর্য, তখনই অর্পিতার মুখ দিয়ে উল্টো বুলি বেরিয়ে এল, কিন্তু লাল্টু, বুবলি তো অত দূরে যেতে চাইছে না।

–কেন?

–এমন জায়গায় থাকা অভ্যেস... তুলনায় ওদিকটা তো পাড়াগাঁ। ওরা চাইছে ফ্ল্যাট। এদিকেই কোথাও।

–হুম। ফ্ল্যাটের কথাও ভাবা যায় অবশ্য। তৈরি হচ্ছে এমন ফ্ল্যাট যদি টারগেট করা যায়... ধরো, তুমি এখন অ্যাডভান্স করলে... পরে জয়েন্ট লোন নিয়ে আমরা কিনে ফেললাম।

অমল বলল, দূর দূর, ফ্ল্যাটের চক্করে যেও না। করলে জমি কিনে দু'জনে মিলে জম্পেশ একটা বাড়ি বানাও। একেবারে নিজেদের মনের মত করে।

–সে আপনার শালী যা চাইবে তা-ই হবে। বলতে বলতে শুভেন্দুর মুখে একগাল হাসি। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবার কষ্টেশিষ্টে মাথার ওপর একটা ছাদ বানিয়ে ফেলবই অমলদা।

অমল ভুরু নাচিয়ে অর্পিতাকে বলল– কি হে, এবার একটু ঘাড় কাত করো। লাল্টু কোথায় চাকরি নিয়ে চলে যাবে, বুবলিও থাকবে শ্বশুরবাড়িতে... আলটিমেটলি পড়ে রইলে তো তোমরা দু'জন। দুই বুড়োবুড়ি। তখন এই ভিড়-ধুলো ধোঁয়ার চেয়ে শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ি বানানোই কি ভাল নয়?... ভাবছ কি? আরে বাবা, বাড়ি করার পুরো টেনশন তো তোমায় আর নিতে হচ্ছে না।

সেই মুহূর্ত থেকেই বাড়ি কেনা, ফ্ল্যাট করার বাসনাটা যেন বিষ হয়ে গেছে। অর্পিতার সেই মনটাকে যেন আরও তেতো করে দিয়ে গেল কমলেশ।

দুশ্চরিত্র স্বামীর সাহায্য ছাড়াই অর্পিতা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এই অহংটুকু নিয়েই তো অর্পিতার বেঁচে থাকা। ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এক নিটোল বৃত্ত রচনা করে নিয়েছিল, সে-ই ছিল তার সুখ। পরিশ্রম, ক্লান্তি, দৈনন্দিন উদ্বেগ তাকে জর্জরিত করেছে, কিন্তু গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। তুচ্ছ স্বস্তির লোভ দেখিয়ে এ কোথায় তাকে টেনে নামাতে চায় দিদি, জামাইবাবু কমলেশের দল? এবার থেকে শুভেন্দুর সঙ্গে একাসনে বসতে হবে অর্পিতাকে? এমনকি লাল্টু-বুবলির চোখেও? তার এতকালের আত্মত্যাগের অহংকার এতই মূল্যহীন?

ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। উঠে বাথরুমে গেল অর্পিতা। ঘাড়ের কাছে শিরাটা দপদপ করছে, ঘাড়ে-মুখে জল দিল ভাল করে। আয়নার দিকে তাকাল না, রুমালে ঘাড়-গলা মুছে পায়ে পায়ে এজিএমের চেম্বারে।

–আসতে পারি স্যার?

–ও শিয়র। আসুন আসুন।

অর্পিতা সামান্য ইতস্তত করে বলল, আপনার টেলিফোন থেকে আসানসোলে একটা কল করতে পারি?

–হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন না।

বার তিনেকের চেষ্টায় লাইন মিলল। কপাল ভাল, লাইনে আজ ক্যারক্যার নেই।

ওপারে রথীন দাস এসেছে, হ্যালো?

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

–আমি কলকাতা থেকে বলছি। অর্পিতা সেন।

–ও, বউদি! বলুন?

ম্যাডাম থেকে বউদি হয়েছে অর্পিতা। কানে লাগে।

অর্পিতা গলা ঝাড়ল। শুনুন, আপনাদের শুভেন্দুদা এখন তো অনেকটাই ভাল। ডাক্তার বলছিল এবার কাজে জয়েন করতে পারে।

–বাহ্, সুসংবাদ। শুভেন্দুদাকে ভাল করে তোলার ক্রেডিটটা কিন্তু আপনারই বউদি।... কবে আসছেন শুভেন্দুদা?

–এ মাসের মধ্যেই যাবে।

–আমরা কিন্তু এদিকে কাজ এগিয়ে রেখেছি বউদি। শুভেন্দুদা জয়েন করলেই ট্রান্সফারটা দু'এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে।

–হ্যাঁ, ওই ব্যাপারেই কথা বলার জন্য...। অর্পিতা স্বর শক্ত করল। এক্ষণি ওর কলকাতায় আসার দরকার নেই।

–সে কি? কেন?

–আমি চাইছি ও আসানসোলেই থাকুক।

রথীন দু'এক সেকেন্ড চুপ। তারপরই উদ্বিগ্ন স্বর বেজে উঠেছে। কিন্তু বউদি, এখানে এলেই তো আবার...। আপনি তো সবই জানেন।

–মনে হয় সেটার সম্ভাবনা এখন কম। অর্পিতা আড়চোখে একবার বিমলকে দেখে নিল। তাছাড়া আপনারা তো ওখানে রইলেনই...।

–কিন্তু প্রবলেমটা কি হল?

–ও এখানে ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছে না। দীর্ঘকালের অনভ্যাস...।

–শুভেন্দুদাকে আপনি পৌঁছে দিতে আসছেন তো?

–দরকার হবে না। ও একাই যেতে পারবে।

টেলিফোন নামিয়ে বিমলের কৌতূহল নিরসনের জন্য আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অর্পিতা। নিজের চেয়ারে ফিরে টের পেল শরীর জোরো রোগীর মত কাঁপছে। বুক ঠেলে একটা কান্নাও উঠে আসছে যেন। আবার একই সঙ্গে এক অনাবিল মুক্তির স্বাদ।

অর্পিতা চেয়ারের হাতল সজোরে চেপে ধরল। সামলাচ্ছে নিজেকে। এবার বাড়ি ফিরেই রূঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে শুভেন্দুকে। আজই। শুভেন্দু খুবই আহত হবে। ছেলেমেয়ের কাছেও অপ্রিয় হবে অর্পিতা। চেনাজানা পৃথিবীতে প্রতিপন্ন হবে, অর্পিতা এক অতি নিষ্ঠুর নারী।

হোক। অর্পিতার তাতে কিছু যায় আসে না। জীবনের কোন কোন বাঁকে নিষ্ঠুরতারও প্রয়োজন আছে।